দৈনিক বজ্রশক্তি
Dainik Bajroshakti

সংকলন

রেজিঃ ডিএ ৬২৬৯, সংখ্যা-০৭।
শ্রাবণ ১৪২২ । আগষ্ট ২০১৫।
শাওয়াল ১৪৩৬ । ৩২ পৃষ্ঠা ১০ টাকা

জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম নিরাপত্তার ক্ষেত্রে নতুন চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখা দিয়েছে

-প্রধানমন্ত্রী

[এসএসএফ-এর ২৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠানের ভাষণ]

জঙ্গিবাদ নির্মূলে শক্তি প্রয়োগের পাশাপাশি আদর্শিক লড়াইও অপরিহার্য, সে আদর্শ আছে হেযবুত তওহীদের কাছে।

-হোসাইন মোহাম্মদ সেলিম, এমাম, হেযবুত তওহীদ।

জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণে আছে, নির্মূল কখনও সম্ভব নয়

-মনিরুল ইসলাম, যুগ্ম কমিশনার, ডি.এম.পি. (ডিবি)

সামাজিক সহিংসতার রূপ ভয়াবহ দিশেহারা চিন্তাশীল মানুষ মুক্তির পথ কি?

সম্পাদকীয়

বর্তমানে সারা বিশ্ব জঙ্গিবাদ ইস্যুটি নিয়ে টালমাটাল অবস্থার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। মধ্যপ্রাচ্যের শক্তিশালী জঙ্গিগোষ্ঠী আই.এস. বিরাট ভূখণ্ড নিজেদের আয়ত্তাধীনে নিয়ে নিয়েছে। বিশ্বের বড় বড় জঙ্গিদলগুলোও গিয়ে আই.এস. এর সঙ্গে একীভূত হয়ে পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিরুদ্ধে নিজেদের সম্প্রসারণ নীতি গ্রহণ করেছে। পলিটিক্যাল ইসলামিক দলগুলোও নানাবিধ কারণে নিজেদের লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়ে একরকম চাপে পড়েই আন্ডারগ্রাউন্ড দলে পরিণত হচ্ছে। তারাও উপায়ান্তর না পেয়ে আল কায়েদা, তালেবান, আই.এস, ইত্যাদি দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাচ্ছে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত মুসলিমরাও উপর্যুপরি সামাজিক নিগ্রহ থেকে ক্ষুব্ধ হয়ে পালিয়ে গিয়ে জঙ্গিদলগুলোতে যোগ দিচ্ছে। এই দলগুলোকে তারা তাদের সুদীর্ঘ পরাধীনতা ও শোষণের হাত থেকে মুক্তির আশ্রয় হিসাবে ভেবে নিচ্ছে।

আমাদের দেশ বিশ্বের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠতার দিক থেকে দ্বিতীয় অবস্থানে আছে। পাশ্চাত্যের পরাশক্তিধর রাষ্ট্রগুলো চায় সমগ্র বিশ্বে আধিপত্য বিস্তার করতে, সবার উপর ছড়ি ঘোরাতে। এজন্য তারা গত দেড় যুগ ধরে জঙ্গিবাদ ইস্যুটিকে মোক্ষম হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করে যাচ্ছে। আমাদের দেশেও তাই একটি জঙ্গি ইস্যুকে বড় করে তোলার ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। একদিকে পলিটিক্যাল ইসলামের পরাজয় অপরদিকে ইসলামবিদ্বেষীদের উপর ধারাবাহিক হত্যার ঘটনাগুলো আমাদের দেশকেও ভয়াবহ পরিণতির দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। বাকস্বাধীনতা, মুক্তচিন্তার নামে একদিকে চলছে ধর্মের কদর্য নিন্দাবাদ, অন্যদিকে চলছে ধর্মের নামে জঙ্গিবাদ। এই উভয় সংকটে পড়ে দিশেহারা জনগণ, সরকার ও তার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। তারা বুঝতে পারছেন যে, জঙ্গিবাদ এমন এক সমস্যা যা শুধু শক্তি প্রয়োগ করে সমাধান করা কখনোই সম্ভব নয়, বরং যত শক্তি প্রয়োগ করা হবে ততই তারা আরো বেপরোয়া হবে, কেননা তারা এই সন্ত্রাসকে জেহাদ বলে বিশ্বাস করে। অপরদিকে ধর্মের নামে নানা অনাচার ও বুদ্ধিহীন অন্ধত্ব দেখে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতদের একটি বিরাট অংশ ইতোমধ্যেই ধর্মবিদ্বেষী বা ধর্মঅবিশ্বাসী হয়ে গেছে। তারাও দমার পাত্র নয়। পরিণামে ধ্বংসের মুখে এগিয়ে যাচ্ছে ষোল কোটি জনতা।

এখন এই সংকটজাল থেকে জাতিকে মুক্ত করাই সরকারের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। এই কাজে সরকারকে সহযোগিতা করার জন্য এমন একটি আদর্শ প্রয়োজন যা দিয়ে জঙ্গিবাদ ও ইসলামবিদ্বেষ উভয়কেই প্রতিহত করা সম্ভব। সেই আদর্শ নিয়ে এগিয়ে এসেছে হেযবুত তওহীদ। আমাদের এবারের সাপ্তাহিকটি হতে পারে জাতির সংকট থেকে মুক্তির সবচেয়ে বড় হাতিয়ার।

> “আমাদের এই প্রস্তাবনা কোনো রাজনৈতিক বা অন্য কোনো উদ্দেশ্য প্রণোদিত নয়। জাতির একটি অংশ আজ বিপদগামী হয়ে নিরীহ মানুষজনকে হত্যা করছে এবং নিজেদের জীবন বিসর্জন দিচ্ছে। এটা আমাদের ব্যথিত করে বলে সরকারের কাছে অকপট ও আন্তরিক চাওয়া। নিরীহ ও নিরপরাধ মানুষের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তার স্বার্থে প্রস্তাবনাটি বিবেচনা করে দেখতে অসুবিধা থাকার কথা নয়।”

সূচিপত্র

- জঙ্গিবাদের চ্যালেঞ্জে বাংলাদেশ আদর্শিক লড়াই অপরিহার্য-২
- জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে শুধু শক্তি প্রয়োগ নয় আদর্শিক লড়াই অপরিহার্য- ৮
- হেযবুত তওহীদকে নিয়ে ভাবতে হবে-১১
- ব্রিটিশ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা: গলদ কোথায়?-১৩
- ধর্মবিদ্বেষীদের হত্যার পথ ইসলাম সম্মত নয় কেন? -১৫

প্রকাশক ও সম্পাদক: এস এম সামসুল হুদা ১৩৯/১, তেজকুনী পাড়া, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫ কর্তৃক মিডিয়া প্রিন্টার্স, ৪৪৬/এইচ, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। **উপদেষ্টামণ্ডলী:** মসীহ উর রহমান, উম্মুত তিজান মাখদুমা পন্নী, রুফায়দাহ পন্নী, **বার্তা ও বাণিজ্যিক কার্যালয়:** ২২৩, মধ্য বাসাবো, সবুজবাগ, ঢাকা- ১২১৪, ০২-৭২১৮১১১, ০২-৮১১৯০৭৬, ০১৭৭৮-২৭৬৭৯৪, **বিজ্ঞাপন বিভাগ:** ০১৮১৬৭১২১৫৮ ওয়েব: www.bajroshakti.com ই-মেইল: bajroshakti@gmail.com

জঙ্গিবাদের চ্যালেঞ্জে বাংলাদেশ

আদর্শিক লড়াই অপরিহার্য

মোহাম্মদ আসাদ আলী

বাংলাদেশ জঙ্গি ও সন্ত্রাসমুক্ত হলেও চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে -প্রধানমন্ত্রী

জঙ্গিবাদ এ দেশ থেকে একেবারে নির্মূল করা সম্ভব নয়। আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠনদের নানা কার্যক্রমে এ দেশেও জঙ্গি তৎপরতায় অনেকে উৎসাহিত হচ্ছে। -মনিরুল ইসলাম

প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য: জঙ্গিবাদের চ্যালেঞ্জে বাংলাদেশ

এসএসএফ- এর ২৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী মন্তব্য করেন যে, ***'বিশ্বে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসী কার্যক্রমের কৌশল পরিবর্তন হচ্ছে দিন দিন। নানা ধরনের সংঘাত বাড়ছে। বাংলাদেশকে আমরা এই সংঘাত থেকে দূরে রাখার চেষ্টা করেছি। বিষয়টি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে নতুন চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিয়েছে।'*** তারপর ঠিক পরের সপ্তাহেই সংবাদ সম্মেলনে ডিএমপির যুগ্মকমিশনার মনিরুল ইসলাম প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যকে প্রকারান্তরে সমর্থন করেই বললেন, **গত দুই বছরে ইরাক, সিরিয়াসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জঙ্গি তৎপরতার প্রভাব বাংলাদেশেও পড়েছে। আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠনদের নানা কার্যক্রমে এ দেশেও জঙ্গি তৎপরতায় অনেকে উৎসাহিত হচ্ছে।** আর সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ যে কথাটি তিনি বলেছেন তা হলো, **জঙ্গিবাদ এ দেশ থেকে একেবারে নির্মল করা সম্ভব নয়। তবে আমাদের (আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর) অভিযানের কারণে তা নিয়ন্ত্রণে আছে। (প্রথম আলো অনলাইন, ২৮.০৭.২০১৫)।**

আমরা মনে করি- বর্তমানের বৈশ্বিক ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা বিধানের স্বার্থে উপরোক্ত মন্তব্যগুলো গভীরভাবে পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য থেকে এটা পরিষ্কার বোঝা যায়- আন্তর্জাতিক জঙ্গিবাদ ইস্যুতে বাংলাদেশ পরিস্থিতি বিভিন্ন কারণে সম্পর্কিত এবং বিষয়টি বাংলাদেশের মৌলিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ভয়াবহ হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। একই আশঙ্কা প্রকাশ পেয়েছে গোয়েন্দা কর্মকর্তার মন্তব্য থেকেও। কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে চ্যালেঞ্জের কথা বলেছেন তার মোকাবেলা তিনি কীভাবে করবেন তার অস্বচ্ছতা যেমন ভাবনার বিষয়, তেমনই আশঙ্কার বিষয় গোয়েন্দা কর্মকর্তার মন্তব্যটি যেখানে তিনি বক্তৃতার আশ্রয় না নিয়ে খুব সোজাভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর দ্বারা জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণ (Control) করা গেলেও নির্মূল (uprooted) করা সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় প্রশ্ন হলো- ***নিরাপত্তা বিধানে বাংলাদেশের সামনে চ্যালেঞ্জ যদি থেকেই থাকে, এবং প্রচলিত পন্থায় সেটা এখন পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত করা গেলেও নির্মূল যদি সম্ভব না-ই হয়, তাহলে সেই বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সরকার নতুন কী পদ্ধতি অবলম্বন করবে?***

আজ পৃথিবীর বিশাল ভূ-খণ্ড জঙ্গিবাদ নামক ভয়াবহ মহামারিতে আক্রান্ত। এ মহামারি যেন থামার নয়। পৃথিবীর বড় বড় রাষ্ট্রপ্রধানদের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছে জঙ্গিবাদ। মুসলিম নামধারী জাতিটির প্রত্যেকটি রাষ্ট্রনায়ক চিন্তিত ও শঙ্কিত। মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ব্যয় করা হচ্ছে, নতুন নতুন আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে, জঙ্গিদেরকে জেলে দেয়া হচ্ছে, সাজা বৃদ্ধি করা হচ্ছে, ফাঁসিতে ঝুলানো হচ্ছে; অর্থবল, অস্ত্রবল ও মিডিয়া- তিন শক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার করে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে আপাতদৃষ্টে এক অসম লড়াই চলছে পৃথিবীব্যাপী, কিন্তু ফলাফল- শুন্য। একজন জঙ্গি মরলে দশজন তৈরি হচ্ছে। ১৮ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে বিবিসিতে প্রকাশিত 'বিশ্ব সন্ত্রাসবাদ সূচক- ২০১৪' রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, ২০১২ ও ২০১৩ সালের মধ্যবর্তী সময়ে সন্ত্রাসী হামলায় নিহতের হার শতকরা ৬১ ভাগ বেড়ে গেছে। সেখানে আরও বলা হয়, বিশ্বে কেবল সন্ত্রাসের (জঙ্গিবাদের) তিব্রতাই বাড়ে নি, এর প্রসারও বেড়েছে। এদিকে চলতি বছরে জঙ্গিবাদের উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে- আগের বছরের তুলনায় ২০১৪ সালে বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা এক তৃতীয়াংশ বেড়েছে। আর চলতি বছরের ঘটনাপ্রবাহ

থেকে এখনই নিশ্চিত হওয়া যায় যে, বৈশ্বিক জঙ্গিবাদের ঊর্ধ্বমুখী সূচকে এ বছরটিও নতুন মাত্রা লাভ করবে।

আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদ: বাংলাদেশ পরিস্থিতি কীভাবে সম্পর্কিত?

ষোল কোটি মানুষের মাতৃভূমি বাংলাদেশের প্রায় ৯০ ভাগ মানুষ মুসলমান। তারা আল্লাহ, আল্লাহর রসুল ও ইসলামকে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসে। এ অঞ্চলের মানুষের ধর্মের প্রতি টান হাজার বছর পুরানো। এটা তাদের রক্ত-মাংসের সাথে মিশে আছে। একে জীবন থেকে কোনোভাবেই আলাদা করা সম্ভব নয়। এই শুভ চেতনাই আজ বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে আমাদের দেশের জন্য। আন্তর্জাতিক জঙ্গিগোষ্ঠীর সাথে এ দেশের বেশ কিছু জঙ্গি সংগঠনের আদর্শ ও কর্মপদ্ধতিগত সমন্বয় রয়েছে- এ অভিযোগ বহু পুরনো। মধ্যপ্রাচ্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চল দখলকারী আইএস চাচ্ছে। এটাও চাচ্ছে কয়েক যুগ থেকে। সম্প্রতি আইএস মহানবীর ভবিষ্যদ্বাণীকৃত হাদিস (যদিও অনেক হাদিসের বিশুদ্ধতা নিয়ে খোদ হাদিসবেত্তাদেরই প্রচুর মতভেদ রয়েছে, হাদীসের নামে বহু দয়ীফ, জাল বা ভুয়া হাদীস প্রচলিত আছে) মিলিয়ে মিলিয়ে ইসলামী খেলাফতের নামে এমন একটি কৃত্রিম কাঠামো দাঁড় করিয়ে ফেলছে যে, ধর্মবিশ্বাসী মানুষদের মধ্যে একটি বড় অংশ মনে করছে আইএস এর মাধ্যমেই বিশ্বে শান্তি আসবে, ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে এবং পাশ্চাত্যের দুঃশাসন থেকে মানুষ চূড়ান্তভাবে মুক্তিলাভ করবে। সুতরাং এর দ্বারা এতে তারা একদিকে যেমন শান্তি পাবে, অন্যদিকে তারা উম্মতে মোহাম্মদী হতে পারবে, অর্থাৎ এটি তাদের ধর্মীয় কর্তব্য। ইতোমধ্যেই হাজার হাজার যুবক এই ধ্যানধারণা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে কথিত জেহাদ করছে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ধর্মপ্রাণ মানুষ ছুটছে ইরাক-সিরিয়ার পথে। আধুনিক পৃথিবীতে ধনে-সম্পদে, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, শিল্প-সাহিত্যে, সামরিক

আধুনিক পৃথিবীতে ধনে-সম্পদে, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, শিল্প-সাহিত্যে, সামরিক শক্তিতে অর্থাৎ পার্থিব উন্নতির আইডল হিসেবে বিবেচিত হয় ইউরোপ। সেই ইউরোপ থেকে যখন দলে দলে ধর্মপ্রাণ মানুষ সমস্ত বাধার প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে, প্রাণের মায়া ত্যাগ করে সিরিয়া-ইরাকে ছুটছে তখন আমাদের দেশের দারিদ্র-কষ্টে জর্জরিত সরলপ্রাণ ধর্মবিশ্বাসী মানুষগুলোর ভবিষ্যৎ নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করা যেতেই পারে। এ কথা ভুললে চলবে না যে, এমনই এক ধরনের প্রেক্ষাপট অর্থাৎ আফগানিস্তানে সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে কথিত জেহাদ থেকেই এক সময় বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের উত্থান ঘটেছিল। জঙ্গিদের এই পথ যে ভুল, এই কোরবানী ও প্রচেষ্টার বিনিময়ে তারা যে আল্লাহর কাছ থেকে কিছুই লাভ করবে না, বরং তাদের দ্বারা ইসলামের শত্রুরাই লাভবান হচ্ছে এ কথা তাদেরকে কে বোঝাবে, সাধারণ মানুষকেই বা কে বোঝাবে?

যোদ্ধারা এখন কার্যত সারা বিশ্বের জঙ্গি ও জঙ্গিসমর্থকদের আদর্শিক 'হিরো'তে পরিণত হয়েছে। ইউরোপ-আমেরিকাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে ধর্মপ্রাণ মানুষ কথিত জেহাদের নেশায় ছুটে যাচ্ছে ইরাক-সিরিয়ায়। 'জেহাদী তামান্না' বাংলাদেশের মানুষের মধ্যেও আছে এটা অস্বীকার করার উপায় নেই। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ থেকে আইএসে যোগদানের উদ্দেশ্যে ইরাক যাবার পথে বিমানবন্দর থেকে কয়েকজনকে আটক করার ঘটনা ঘটেছে। আবার সম্প্রতি ব্রিটেনে বসবাসকারী বাংলাদেশি বংশদ্ভূত ১৩ সদস্যের একটি পরিবার আইএসে পাড়ি জমিয়েছে। চিন্তা বিষয় হলো- সরাসরি ব্রিটেন থেকে না গিয়ে তারা আইএস'এ গেছে বাংলাদেশ থেকে, এবং কিছুদিন পরে প্রকাশিত একটি ভিডিওতে পরিবারটি দাবি করে যে, সেখানে তারা খুব শান্তিতে বসবাস করছে, নিরাপদে আছে। এতটা শান্তি ও নিরাপত্তা নাকি তারা কোথাও পায় নি।

আমরা জানি গণতান্ত্রিক পুঁজিবাদী ব্যবস্থার নিষ্পেষণ থেকে মানুষের মুক্তির জন্য যখন সমাজতন্ত্রের আবিষ্কার হলো, তখন সমাজতন্ত্রের মধ্যে মুক্তি আছে মনে করে পঙ্গপালের মতো লক্ষ লক্ষ মানুষ সমাজতন্ত্রের শিখায় ঝাঁপ দিল। কিন্তু কিছুদিন পরেই তাদের স্বপ্নভঙ্গ হলো, তারা বুঝতে পারল যে তারা কড়াই থেকে লাফিয়ে চুলায় পড়েছে। এখন বাংলাদেশসহ অন্যান্য দেশের গণতান্ত্রিক হানাহানির বীভৎসতা থেকে মানুষ মুক্তি শক্তিতে অর্থাৎ পার্থিব উন্নতির আইডল হিসেবে বিবেচিত হয় ইউরোপ। সেই ইউরোপ থেকে যখন দলে দলে ধর্মপ্রাণ মানুষ সমস্ত বাধার প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে, প্রাণের মায়া ত্যাগ করে সিরিয়া-ইরাকে ছুটছে তখন আমাদের দেশের দারিদ্র-কষ্টে জর্জরিত সরলপ্রাণ ধর্মবিশ্বাসী মানুষগুলোর ভবিষ্যৎ নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করা যেতেই পারে। এ কথা ভুললে চলবে না যে, এমনই এক ধরনের প্রেক্ষাপট অর্থাৎ আফগানিস্তানে সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে কথিত জেহাদ থেকেই এক সময় বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের উত্থান ঘটেছিল। জঙ্গিদের এই পথ যে ভুল, এই কোরবানি ও প্রচেষ্টার বিনিময়ে তারা যে আল্লাহর কাছ থেকে কিছুই লাভ করবে না, বরং তাদের দ্বারা ইসলামের শত্রুরাই লাভবান হচ্ছে এ কথা তাদেরকে কে বোঝাবে, সাধারণ মানুষকেই বা কে বোঝাবে?

এমনিতেই বিভিন্ন সময়ে উন্মাদনা সৃষ্টি করে কথিত জেহাদী তামান্না সৃষ্টি করা হয় বাংলাদেশে যা বার বার আমরা দেখেছি। ধর্মকে ব্যবহার করে রাজনীতিক উদ্দেশ্য হাসিল করার ঘটনা এ দেশে অহরহ ঘটে। এছাড়াও রয়েছে মানুষের ধর্মীয় সেন্টিমেন্টকে কাজে লাগিয়ে ব্যক্তিগত অর্থোপার্জনের দৃষ্টান্ত। এক কথায় আমাদের দেশের ধর্মপ্রাণ মানুষের ঈমানকে হাইজ্যাক করে থাকে এক শ্রেণির স্বার্থবাদী। তার উপর এই জঙ্গিবাদের অশুভ ছায়া। সরকার শক্তি প্রয়োগ করে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী দিয়ে তাদের দমিয়ে রাখার চেষ্টা

করেছে। অতি শক্তি সম্পন্ন গ্যাস বোতলের ঢুকিয়ে দিয়ে যেমন ছিপি দিয়ে আটকিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়, ঠিক সেরকম করা হয়েছে। ফলে যতটুকু উপশম হওয়ার হয়েছে, কিন্তু নির্মূল হয়ে যায় নি। ঝুঁকি থেকেই গেছে। ধর্মের বিবিধ অপব্যবহারের এই সংস্কৃতি এবং আন্তর্জাতিক গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করে এ কথা বলায় দোষের কিছু থাকে না যে, বাংলাদেশ ভয়াবহ বিপদের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে। সাবধান! মাথার উপর কিন্তু চক্কর দিচ্ছে চিল!

শক্তি প্রয়োগের প্রচলিত পন্থায় জঙ্গিবাদ দমন সম্ভব নয় কেন?

জঙ্গি বা জঙ্গি মনোভাবাপন্ন গোষ্ঠী আন্তরিকভাবে চায় যে তাদের জীবনে আল্লাহর আইন-বিধান প্রতিষ্ঠিত হোক। কোর'আনের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য তারা এমনভাবে অনুপ্রাণিত (Motivated) ও সংকল্পবদ্ধ (Determined) যে তারা আল্লাহর রাস্তায় নিজেদেরকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করে দিয়েছে। তারা কোনো পার্থিব স্বার্থে এ পথ বেছে নেয় নি। তারা আল্লাহকে, আল্লাহর রসুলকে ভালোবাসে ও পরকালে বিশ্বাস করেন। তারা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে যে, ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন উৎসর্গ করতে পারলেই তারা চূড়ান্ত সফল, এর বিনিময়ে আখেরাতে জান্নাতে যেতে পারবে। এজন্য শরীরে বাঁধা বোমা ফাটিয়ে নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করে প্রাণ বিসর্জন দিতেও তারা কুণ্ঠিত হচ্ছে না, এবং এমন লোকের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলছে। প্রকৃত ইসলাম সম্পর্কে তাদের ধারণা (আকিদা) ভুল ও বিকৃত হওয়ার কারণে এরা বুঝতে পারছে না যে, তারা যে সন্ত্রাসের পথ গ্রহণ করেছে সেই পথে চললে তারা দুনিয়াও পাবে না, আখেরাতও পাবে না অর্থাৎ দুই কূলই হারাবে। যতদিন তারা তাদের এই ভুল না বুঝতে পারবে ততদিন শক্তি প্রয়োগ করে বড়জোর তাদের কার্যক্রমকে কিছু সময়ের জন্য স্তিমিত করা যেতে পারে, বন্ধ করা যাবে না। এ কথা যিনি বুঝবেন জঙ্গিবাদের সমাধান তার দৃষ্টিতে খুব কঠিন মনে হবে না।

যুক্তরাষ্ট্রের মতো পরাশক্তি তালেবান-আল কায়েদার মোকাবেলায় ব্যর্থ হয়ে আফগানিস্তান থেকে ফিরে গেছে এবং নিজেদের অসফলতার কথা পুনঃ পুনঃ স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন তাদের কর্তাব্যক্তিরা। বারাক ওবামা নিজে বলেছেন, "বুলেট-বোমা দিয়ে জঙ্গিবাদ মোকাবেলা করা যাবে না, বিকল্প পন্থা খুঁজতে হবে।" তালেবান ও আল কায়েদার বিরুদ্ধে প্রায় এক যুগ লড়াই করার পর ঈঙ্গ-মার্কিন শক্তি অসহায়ের মতো এসব স্বীকারোক্তি করেছে। এর মাঝে তারা কী পরিমাণ শক্তি প্রয়োগ করেছে, কী অঢেল অর্থব্যয় করেছে তা বিজ্ঞ মানুষমাত্রই জানেন। বছর কয়েক আগের ইউরোপ-আমেরিকায় সংঘটিত বিরাট অর্থনীতিক মন্দার পেছনে অন্যতম কারণ ছিল এই সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর অকল্পনীয় অর্থব্যয়। অথচ এত এত অর্থব্যয়ের পর, সামরিক শক্তিতে অপ্রতিরোধ্য বলে কথিত পরাশক্তিগুলো ব্যর্থতার গ্লানি বরণ করছে। সামরিক শক্তি, অর্থবল ও মিডিয়ায় সমৃদ্ধ বিশ্বের পরাশক্তি রাষ্ট্রগুলোই যদি শুধুমাত্র শক্তি প্রয়োগ করে জঙ্গিবাদ নির্মূল করতে ব্যর্থ হয় তাহলে আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের দরিদ্র দেশের সরকার যে ব্যর্থ হবে তা বোঝাই যায়। প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে বিকল্প পন্থা খোঁজার ঘোষণা দিয়েছেন ২০০৯ সালে (BBC, The STAR, 3 April, 2009), কিন্তু বিকল্প কোনো পন্থা না পাওয়ায় তারা আজও প্রচলিত শক্তি প্রয়োগের পন্থার উপরই নির্ভর করছে। আমাদের প্রধানমন্ত্রীও পূর্বোল্লিখিত ভাষণে স্বীকার করেছেন যে, জঙ্গিরা নতুন নতুন কৌশল ধারণ করছে, সে ক্ষেত্রে শুধুমাত্র শক্তি প্রয়োগের পন্থাতেই কি সরকার সীমাবদ্ধ থাকবে? নাকি শক্তি প্রয়োগের পাশাপাশি নতুন কোনো সমাধানের খোঁজ করবে? শুধু শক্তি ও অর্থব্যয়ের ব্যর্থতার আরেক প্রমাণ হলো- খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পাকিস্তান সরকার ও আফগান সরকার এখন তালেবানদের সাথে আলোচনা-পরামর্শের ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করছে, যা আগে খুব কমই ঘটেছে।

সুতরাং বোঝা গেল, শক্তি প্রয়োগের প্রচলিত পন্থায় সম্পূর্ণভাবে জঙ্গিবাদ নির্মূল সম্ভব নয়। অথচ জঙ্গিবাদ দমনে বাংলাদেশ সরকার বরাবরই কেবল শক্তি প্রয়োগের নীতি অবলম্বন করে এসেছে। শক্তি প্রয়োগেরও দরকার আছে, একেবারে শক্তি ছাড়াও হবে না। শক্তি প্রয়োগ কখন ও কীভাবে করতে হবে এই বিষয়ে প্রবন্ধের শেষে আলোকপাত করা হবে। কিন্তু জঙ্গিবাদ মোকাবেলার মূল পন্থা ওটা নয়, সন্ত্রাসীদেরকে যদি কোর'আন হাদিস ও ইতিহাস থেকে যুক্তি ও প্রমাণ দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া যায় যে তাদের ভুল কোথায় এবং কেন তারা জীবন উৎসর্গ করলেও আল্লাহ-রসুলের সন্তুষ্টি লাভ করবে না, জান্নাত লাভ করবে না, কেবল তাহলেই তারা জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ড ত্যাগ করতে পারে। সেই সাথে সাধারণ ধর্মপ্রাণ মানুষের মধ্যেও ইসলামের প্রকৃত ব্যাখ্যা প্রদান করে ব্যাপক গণজাগরণ তৈরি করতে হবে। সাধারণ মানুষের ঈমান বা ধর্মবিশ্বাস যতদিন না কল্যাণের পথে ব্যবহার করা যাচ্ছে, ধর্মব্যবসায়ী ও জঙ্গিবাদী গোষ্ঠী ততদিন তাকে অকল্যাণের পথে ব্যবহার করতেই থাকবে। ঈমান আছে মানেই, ধর্মবিশ্বাস আছে মানেই তা ব্যবহৃত হবেই। তাই চেষ্টা চালাতে হবে অকল্যাণের পথে ব্যবহৃত না হয়ে মানুষের ঈমানী শক্তিকে জাতির কল্যাণের পথে ব্যয় করার। জঙ্গিরা যে ভুল পথে আছে তা তাদেরকে বোঝানোর জন্য ও সাধারণ মানুষকে ধর্মব্যবসা, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সচেতন করার জন্য কোর'আন ও হাদিসভিত্তিক যথেষ্ট পরিমাণ তথ্য, প্রমাণ ও যুক্তি আমাদের অর্থাৎ হেযবুত তওহীদের হাতে আছে। এটা যে নিছক আশ্বাসবাণী নয়, প্রকৃতপক্ষেই জঙ্গিদেরকে ভুল প্রমাণ করার মতো যথেষ্ট যুক্তি, প্রমাণ ও তথ্য-উপাত্ত আমাদের কাছে আছে, সেটা অতি স্বল্প পরিসরে আলোকপাত করা হলো।

জঙ্গিবাদের টেকসই সমাধান

সাম্রাজ্যবাদের পাতানো ফাঁদ: জঙ্গিবাদ

পশ্চিমা পরাশক্তিগুলোই এক ঢিলে দুই পাখি মারার উদ্দেশ্যে জঙ্গিবাদ ইস্যুটির জন্ম দিয়েছে। তারপর তা বিশ্বময় রপ্তানি করে নিজেরাই তার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। এ যুদ্ধের স্বল্পমেয়াদী উদ্দেশ্য হলো পররাজ্য দখল করা, পরসম্পদ লুট করা, আর দীর্ঘমেয়াদী উদ্দেশ্য হলো একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী 'ইসলাম'-কে ধ্বংস করে দেওয়া। এর স্বল্পমেয়াদী উদ্দেশ্যটি নিয়ে আলোচনার তেমন প্রয়োজন নেই, এ বিষয়ে বাংলাদেশের একজন খ্যাতনামা আন্তর্জাতিক বিশ্লেষক জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. তারেক শামসুর রেহমানের একটি উক্তিই যথেষ্ট হবে আশা করি। তিনি ২৩ নভেম্বর ২০১৪ তারিখে দৈনিক আলোকিত বাংলাদেশ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে লিখেছেন, "তথাকথিত 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' সূচনা করে মুসলিম বিশ্বকে পদানত রাখার পরিকল্পনা যুক্তরাষ্ট্র শুরু করেছে। দেশটি আফগানিস্তানে যুদ্ধের সূচনা করে, তা এখন সম্প্রসারিত হয়েছে মধ্যপ্রাচ্যে।" আর দীর্ঘমেয়াদী উদ্দেশ্য হলো কম্যুনিজমের পতনের পর তার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী 'ইসলাম'-কে ধ্বংস করে দেওয়া। এটা এখন পশ্চিমা আগ্রাসনকারীদের আত্মস্বীকৃত বিষয়। অনেকেই স্বীকার করেছেন, অনেকে এ নিয়ে দম্ভোক্তিও করেছেন।

জঙ্গিবাদের উদ্গাতা কারা? কাদের পৃষ্ঠপোষকতায় জঙ্গিবাদ বিস্তার লাভ করেছে এবং জঙ্গিবাদ থেকে লাভবান হচ্ছে মূলত কারা? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক সেক্রেটারি অব স্টেট হিলারি ক্লিনটন বলেন, "আজকে আমরা যে আল কায়েদার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি কুড়ি বছর আগে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আমরাই তাদেরকে সৃষ্টি করেছি, তাদেরকে অর্থ যুগিয়েছি।' [১ জুন ২০১৪, ফক্স নিউজ, সি.এন.এন]। অন্যদিকে পাকিস্তানের সাবেক সেনাশাসক জেনারেল পারভেজ মোশারফকে বলতে শোনা গেছে- তালেবান আমেরিকার সৃষ্টি, (ডন, ০৫.১২.১৪)। আর বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যের বিষফোঁড়া আইএস- এর জন্মের প্রেক্ষাপট যারা জানেন তাদেরকে বলে দিতে হবে না যে, কীভাবে পশ্চিমা জোট আসাদ সরকারকে ক্ষমতাচ্যুৎ করার প্রচেষ্টায় আইএসকেই একদা সমর্থন ও সহযোগিতা প্রদান করে শক্তিশালী করেছে। এমনকি ইরাকের বিস্তীর্ণ অঞ্চল দখল করার পরও কুর্দীদের অস্ত্র দেবার নাম করে আকাশ থেকে আইএসকে অস্ত্র প্রদান করেছে যুক্তরাষ্ট্রই। অবশ্য জঙ্গিরাও অকৃতজ্ঞ নয়; তালেবান, আল কায়েদা বা আইএসের মতো জঙ্গিগোষ্ঠীগুলো পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদকে পৃথিবীব্যাপী শোষণ অব্যাহত রাখতে যতখানি সুযোগ করে দিয়েছে তা অতীতে কেউ পেরেছে বলে মনে হয় না।

আমরা সবাই জানি, আশির দশকে সংঘটিত রুশ-আফগান যুদ্ধটিই হচ্ছে জঙ্গিবাদের সূতিকাগার। এ সময়টিতে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সি.আই.এ এবং পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা আই.এস.আই. আফগানদেরকে জঙ্গি প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে। ১৯৮০ থেকে ১৯৯৪ এই সময়ের মধ্যে আফগানিস্তানে একটি সশস্ত্র বাহিনী তৈরিতে যুক্তরাষ্ট্র প্রায় ৫৩ মিলিয়ন ডলার খরচ করেছিল। বিভিন্ন মুসলিম দেশ থেকে লাখ লাখ যুবক আফগানিস্তানে ছুটে গিয়েছিল আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করার জন্য। তারা কি বুঝেছিলেন যে, এটা জেহাদ ফি সাবিলিল্লাহ নয়, এটি রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের যুদ্ধ, এ যুদ্ধে আল্লাহ-রসুলের কিছু আসে যায় না? বুঝতে পারেন নি, কারণ এই যুবকদেরকে প্রাণদানে উদ্বুদ্ধ করার জন্য পশ্চিমারা মুসলমান দেশগুলোতে হাজার হাজার ধর্মব্যবসায়ীকে ভাড়া করছিল যারা তাদের যার যার দেশের যুবকদেরকে ওয়াজ-নসিহত করে যুদ্ধে যোগদানের জন্য উত্তেজিত, অনুপ্রাণিত (Motivated) করে সংঘটিত করেছিল। তারা বলত যে এটা সাধারণ যুদ্ধ নয়, জেহাদ ও কেতাল ফি-সাবিলিল্লাহ। এখানে মরলে শহীদ বাঁচলে গাজি। শুধু তাই নয়, পরবর্তী প্রজন্মকে জঙ্গি হিসাবে গড়ে তোলার জন্য পশ্চিমারা ওই প্রকল্পের আওতায় আফগানিস্তানের বাচ্চাদের পাঠ্যপুস্তকে সন্ত্রাস ও মারণাস্ত্র সম্পর্কিত অনেক প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত করেছিল। সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য কোন কোন অস্ত্র ব্যবহার করলে ভালো হবে এমন তথ্য সেগুলোতে অনায়াসে দেওয়া হয়েছিল। তখন ইংরেজি বর্ণমালা পরিচয়ে 'জে'-তে জেহাদ শেখানো হতো। এমনকি গণনা শেখানোর সময় ৫ বন্দুক + ৫ বন্দুক = ১০ বন্দুক শেখানো হতো। এভাবে হাতে কলমে জঙ্গিবাদের শিক্ষা প্রচার করেছে যারা সেই পশ্চিমারাই আজ জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে চেচিয়ে গলা ফাটাচ্ছেন, সন্ত্রাসবাদবিরোধী যুদ্ধে লিপ্ত হচ্ছেন।

এই সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ যে আসলে পশ্চিমাদের রাজনীতির খেলা, অর্থাৎ Political game, সেটাও প্রমাণিত। এতে তাদের লাভ হচ্ছে তারা খনিজ ও তেলসমৃদ্ধ দেশগুলো দখল করতে পারছে, পাশাপাশি অস্ত্রব্যবসা করে নিজেদের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধ করছে। আমাদের দেশের অর্থনীতিকে যেমন বলা হয় কৃষি অর্থনীতি, তেমনি যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিকে বলা হচ্ছে যুদ্ধ অর্থনীতি (War Economy)। যুদ্ধ না থাকলে তাদের অর্থনীতিতে মন্দা হবে। তাদের প্রয়োজন বিশ্বজোড়া অস্ত্রের বাজার। কিন্তু তারা নিজেরা আর স্বশরীরে যুদ্ধ করতে আগ্রহী নয়। তাদের সৈন্যরা যুদ্ধবিমুখ ও ভোগবাদী। তাই দরকার পড়েছে মুসলমানদের একটি দলকে আরেকটি দলের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দেওয়া। সুতরাং জঙ্গিরা পশ্চিমাদের দৃষ্টিতে অতি প্রয়োজনীয় শত্রু (Useful enemy)। তারা যেমন জঙ্গিদেরকে জিইয়ে রাখতে চায় চূড়ান্ত উদ্দেশ্য হাসিল না হওয়া পর্যন্ত তেমনি, অনেক দেশের সরকারও জঙ্গিবাদ নির্মূল হোক এটা চায় না। জঙ্গিরা থাকলে তাদের বহুমুখী স্বার্থোদ্ধারের পথ খোলা থাকে। (এ বিষয়ে হেযবুত তওহীদের এমামের লেখা বই- 'ধর্মব্যবসায়ী ও পশ্চিমাদের ষড়যন্ত্রের যোগফল: জঙ্গিবাদ' বইতে বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে)

সুতরাং জঙ্গি ও জঙ্গি মনোভাবাপন্ন মুসলমানদেরকে যদি

পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের এই খেলা সম্পর্কে সচেতন করা যায় এবং তারা যদি বুঝতে পারে যে, জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ড থেকে ইসলামের কোনো উপকার তো হয়-ই না, বরং ইসলামের শত্রুরাই লাভবান হয় তাহলে ধর্মপ্রাণ মানুষগুলো আর পশ্চিমা ক্রীড়নকে পরিণত হবে না।

বিকৃত ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম: ভস্মে ঘৃতাহুতি দেয়া

জঙ্গিরা যে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই করছে, জেলে যাচ্ছে, ফাঁসিতে ঝুলছে, শত্রুর গোলা-বারুদে ঝাঁঝরা হচ্ছে সেই ইসলাম আর আল্লাহর রসুলের ইসলাম এক নয়। বর্তমানে ইসলামের নাম করে যে দ্বীনটি প্রচলিত আছে তা বাহ্যিক দৃষ্টিতে প্রকৃত ইসলামের মতো মনে হলেও, আত্মায় ও চরিত্রে আল্লাহর রসুলের ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত। যেটাকে আইএস, বোকো হারাম, আল কায়েদা, ইখওয়ান, তালেবানরা ইসলাম মনে করছে এবং ভাবছে সেটাকে প্রতিষ্ঠা করে স্বর্ণযুগ ফিরিয়ে আনবে সেটা বিগত ১৩০০ বছরের ধারাবাহিক বিকৃতির ফল, প্রকৃত ইসলামের ছিটে ফোটাও এর মধ্যে নেই। দীন নিয়ে অতি বিশ্লেষণকারী আলেম, মুফতি, মোফাস্সের, মোহাদ্দেস, সুফি, দরবেশ ও পীর-মাশায়েখদের অপ্রয়োজনীয় তর্ক-বিতর্ক, বাহাস, মতভেদ ও চুলচেরা বিশ্লেষণের পরিণামে দীনের ভারসাম্য হারিয়ে গেছে অনেক আগেই, সেই ভারসাম্যহীন দীনের ভিন্ন ভিন্ন ভাগকে আঁকড়ে ধরে ছিল ভিন্ন ভিন্ন ফেরকা-মাজহাব, দল-উপদল। এর মধ্যে ইসলাম পারস্যে প্রবেশ করলে সেখানকার পূর্ব থেকে বিরাজিত বিকৃত আধ্যাত্মবাদ ইসলামে প্রবেশ করল। বিকৃত সুফীবাদী ধ্যান-ধারণার প্রভাবে এক সময়ের প্রগতিশীল, অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামী, বহির্মুখী, প্রগতিশীল, উদার, যুক্তিপূর্ণ ইসলাম অন্তর্মুখী, গতিহীন, অযৌক্তিক, পলায়নপর সাধু-সন্ন্যাসের ধর্মে পরিণত হলো। তারপর আসল ব্রিটিশরা। তারা এই জাতির কফিনে শেষ পেরেকটা ঠুকল। আগের শিক্ষাব্যবস্থাকে উপড়ে ফেলে নিজেরা মাদ্রাসা তৈরি করে সেই মাদ্রাসায় ব্রিটিশরা তাদের নিজেদের তৈরি সিলেবাস ও কারিকুলাম অনুযায়ী তাদের সুবিধামতো একটি বিকৃত ইসলাম এই জাতিকে শিক্ষা দিল। ফলাফল- মানবজীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম ত্যাগ করে রসুলাল্লাহর রেখে যাওয়া ঐক্যবদ্ধ জাতি এখন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন, তেহাত্তর ফেরকায় বিভক্ত হয়ে একে অপরের রক্তে হোলি খেলছে। ব্রিটিশদের শেখানো এই বিকৃত ইসলাম পৃথিবীর এক ইঞ্চি মাটিতেও শান্তি আনয়ন করতে ব্যর্থ। সুতরাং একে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে যারা জীবন দেবে, সম্পদ দেবে তারা যে ভস্মে ঘৃতাহুতি দিচ্ছেন তাতে সন্দেহ নেই।

তারা আল্লাহর সাহায্য পাচ্ছেন না কেন?

আল্লাহর দেওয়া দীন প্রতিষ্ঠা করতে হলে আল্লাহর সাহায্য (help, নসর) অবশ্যই লাগবে। আল্লাহর সাহায্য ছাড়া ইসলাম প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তারা যেটা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছে সেটা আল্লাহর ইসলাম নয়। সেটা প্রকৃত ইসলাম হলে তারা অবশ্যই আল্লাহর সাহায্য পেত। আফগানিস্তান, ইরাক, সিরিয়া, লিবিয়া, মিশরসহ কোথাও তো দেখছি না তাদের সাথে আল্লাহর সাহায্য আছে। আল্লাহ যাদের সাহায্য করবেন তাদের পরাজয় অসম্ভব এটা পবিত্র কোরানে আল্লাহ বার বার বলেছেন। কাজেই এতেই প্রমাণিত হয় তারা যেটা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছেন সেটা আল্লাহর ইসলাম নয়।

ইসলামের প্রকৃত আকীদা হারিয়ে গেছে

প্রকৃত আকীদার অনুপস্থিতির কারণে জঙ্গিবাদের পথ আরও প্রশস্ত হচ্ছে। ইসলামে আকীদার গুরুত্ব অতুলনীয়। এই দীনের আলেমদের মধ্যে বিভিন্ন ব্যাপারে মতভেদ থাকলেও এ ব্যাপারে তারা সকলেই একমত যে, আকীদা সঠিক না হলে ঈমানের মূল্য থাকে না। জঙ্গিদের ঈমান আছে, শুধু আছে বললে ভুল বলা হয়, তাদের ঈমান অন্য আর দশজন সাধারণ মুসলিমের চেয়ে অনেক বেশি। দৃঢ় ঈমান না থাকলে কেউ জান দিতে যায় না। কিন্তু এত প্রবল ঈমানের কী দাম থাকে যদি আকীদা ঠিক না হয়? আকীদা হচ্ছে comprehensive concept, সম্যক, সামগ্রীক ধারণা, অর্থাৎ একটি কাজ কেন করা হবে, কীভাবে করা হবে, কখন করা হবে, কোন কাজ আগে কোনটা পরে, কোনটা এখন কোনটা তখন, কোনটা খুব প্রয়োজনীয় কোনটা কম প্রয়োজনীয়, কোনটা না হলেই নয় কোনটা না হলেও চলবে, কোনটার পূর্বশর্ত (precondition) কোনটা, কোন কাজ দ্বারা মানবতার কী উপকার হবে বা কী ক্ষতি হবে ইত্যাদি সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা থাকা। অথচ এই দীনের নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাতসহ যে জেহাদের কথা বলে জঙ্গিবাদ ছড়ানো হচ্ছে সেই জেহাদ সম্পর্কেও জঙ্গিদের আকীদা সঠিক নয়। উপরন্তু আকীদাকে অনেকে ঈমানের সাথেই গুলিয়ে ফেলছেন, অথচ আকীদা ও ঈমান যে পৃথক বিষয় তা সাধারণ জ্ঞানেই বোঝা যায়। ইসলামের জেহাদ কী জন্য, রসুল কখন কোন পরিস্থিতিতে কীভাবে জেহাদ করেছেন, কখন কিতাল করেছেন সে সম্পর্কে সঠিক আকীদা না থাকায় জঙ্গিরা সন্ত্রাসকেই জেহাদ বলে মনে করছে। কাজেই ইসলামের প্রকৃত আকীদা জানতে পারলে অনেক বিপথগামী জঙ্গিই সন্ত্রাস ত্যাগ করবে তাতে সন্দেহ নেই।

জাতিকে আগে তওহীদের জ্ঞান প্রদান করতে হবে

জঙ্গি মনোভাবসম্পন্ন মানুষদেরকে তওহীদের প্রকৃত অর্থ বোঝাতে হবে। দীনের ভিত্তি বা প্রাণ হলো তওহীদ। জীবনের সকল অঙ্গনে যেখানে আল্লাহ ও আল্লাহর রসুলের কোনো কথা আছে, সেখানে অন্য কারোটা না মানাই তওহীদের একমাত্র দাবি। সেই তওহীদ কি আজকের মুসলিম নামধারী জাতির মধ্যে আছে? নেই। আজ এই জাতি জাতীয় জীবন থেকে আল্লাহর হুকুম, বিধি-বিধানকে প্রত্যাখ্যান করে পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী সিস্টেম গ্রহণ করেছে। ইসলাম বলতেই এরা বোঝে নামাজ, রোজা, এবাদত-উপাসনা এবং জিকির-আজগার, তসবীহ-তাহলীল, ওযু, গোসল, মেসওয়াক বা লেবাসের মতো তুচ্ছ ব্যক্তিগত জিনিস। অথচ আল্লাহর নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে, দীনের ব্যক্তিগত ভাগ মেনে ও জাতীয় ও সামষ্টিক ভাগ প্রত্যাখ্যান করে এরা যে

তওহীদ থেকেই বিচ্যুত হয়ে গেছে, আল্লাহর চোখে এরা আর যে মো'মেন নেই, মুসলিম নেই, বরং মোশরেকে পরিণত হয়েছে সে জ্ঞান তাদের নেই। কাজেই যারা পুনরায় ইসলামের স্বর্ণযুগ ফিরিয়ে আনতে চায় তাদেরকে একদিকে যেমন নিজেদের অবস্থান বুঝতে হবে, সেই সাথে বুঝতে হবে জাতি বর্তমানে কোন অবস্থানে আছে। যে জাতিতে তওহীদই নেই, যারা জাতীয় জীবনে আল্লাহর হুকুম, ন্যায় ও সত্যকে অস্বীকার করেছে তাদেরকে তওহীদের আহ্বান না জানিয়ে, তওহীদের মর্মার্থ না বুঝিয়ে অর্থাৎ মানসিকভাবে জাতিকে আল্লাহর বিধান গ্রহণ করার উপযোগী না করে আগেই জেহাদের জিগির তোলা সুবিবেচনার কাজ হতে পারে না। জাতিকে আগে সত্য-মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য বোঝাতে হবে। ন্যায়ের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ হয়ে সমাজ থেকে অশান্তি দূর করার জন্য সংগ্রাম করাই যে একজন মু'মিনের প্রধান কর্তব্য, এবাদত সেটা সকলকে বোঝাতে হবে। তাদেরকে আরও বোঝাতে হবে যে, ধর্মের কোনো বিনিময় চলে না, ব্যবসা চলে না। ধর্মের কাজ হবে একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে। এভাবে জাতিকে আগে ধর্ম-অধর্মের পার্থক্য, ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্য, তওহীদ, শিরক, কুফর ইত্যাদি সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে বোঝাতে হবে। যুগ যুগ ধরে এদের বিশ্বাসে, আচারে, প্রথায় যে অজ্ঞতা বাসা বেধেছে তা দূরীভূত করতে হবে। তা না করে যাদের মুক্তির জন্য সংগ্রাম, সেই সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধেই অস্ত্র ধরা চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচয় প্রদান করে। এভাবে যে ইসলাম প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ শান্তি আনয়ন সম্ভব নয় তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ গত দুই-এক দশকের ভেতরেই পাওয়া যাবে।

ইতিহাসের শিক্ষা

ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াইরত তথাকথিত জেহাদী গোষ্ঠীগুলো তাদের ন্যায্যতা প্রমাণের জন্য রসুলাল্লাহর জীবনী থেকে বিভিন্ন ঘটনার অবতারণা করে থাকেন। তারা তাদের কর্মকাণ্ডের সমর্থনে কোর'আন হাদীসের রেফারেন্সও দিতে পারে। কারণ রসুলাল্লাহ তাঁর নবী জীবনের অধিকাংশ সময়ই বিভিন্ন যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রসুলের পদাঙ্ক অনুসরণ করাই প্রতিটি মু'মিনের কর্তব্য। কিন্তু আরেকটু গভীরে গেলেই প্রকৃত ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। জঙ্গিরা প্রধানত যে ভুলটি করে তাহলো- আল্লাহর রসুলের জীবনের দুইটি ভাগ, অর্থাৎ মক্কা জীবন ও মদীনা জীবনের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণে ব্যর্থতার পরিচয় দেওয়া; অথচ মক্কা ও মদীনায় রসুলাল্লাহর কর্মপদ্ধতি ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। মক্কায় তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে তওহীদের বালাগ দিয়ে গেছেন। শত অন্যায়, অবিচার সহ্য করেছেন। মুশরিকদের নির্দয় আঘাতে রক্তাক্ত হয়েছেন। সঙ্গি-সাথীরা ঘর-বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়েছে। অবরুদ্ধ ও একঘরে জীবনযাপন করেছে। কয়েকজনকে প্রকাশ্যে হত্যা করা হয়েছে। রসুলের সামনে দিয়ে সাহাবীদের টেনে-হিঁচরে নির্যাতন করার উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, রসুলাল্লাহ বাধা পর্যন্ত দিতে পারেন নি। এত নির্যাতনের মাঝেও মক্কা জীবনে যুদ্ধের অনুমতি ছিল না। সেখানে একটাই কাজ- সমস্ত নির্যাতন, নিপীড়ন, ঠাট্টা, বিদ্রূপ উপেক্ষা করে যথাসম্ভব তওহীদের বালাগ চালিয়ে যাওয়া, ঘুমন্ত মানুষগুলোর অন্তরাত্মাকে জাগ্রত করে তোলা, তাদেরকে যাবতীয় অন্যায়-অসত্যের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করা। অতঃপর যখন মদীনায় একটি জনগোষ্ঠী রসুলাল্লাহর আহ্বান গ্রহণ করল, রসুল হেযরত করলেন এবং মদীনার মুসলিম-অমুসলিম সকলকে নিয়ে স্বতঃস্ফূর্ত ইচ্ছা (General will) এবং সাধারণ স্বার্থের ভিত্তিতে (On the basis of common interest) চুক্তির মাধ্যমে একটি ঐক্যবদ্ধ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করলেন, রসুল (স.) তখন নবগঠিত রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান। আর স্বাভাবিকভাবেই নবগঠিত ওই রাষ্ট্রের সাধারণ জনগণের নিরাপত্তার জন্য সেনাবাহিনী ও অস্ত্র-শস্ত্র দরকার পড়েছিল। সেখান থেকেই রাজনীতিক কারণে রসুলাল্লাহ ও তাঁর সাহাবাদের যোদ্ধা জীবন শুরু। সেই যুদ্ধ প্রচলিত রাষ্ট্রনীতি, যুদ্ধনীতি ও ধর্মীয় বিধান কোনো দৃষ্টিতেই অবৈধ ছিল না।

অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে, ব্যক্তি বা দলগতভাবে কেউ অস্ত্র হাতে নিলে সেটা ইসলাম হবে না, কারণ রসুল তা নেন নি। অস্ত্রের ব্যবহার, সেনাবাহিনীর ব্যবহার করতে পারে একমাত্র সার্বভৌম রাষ্ট্র। এই মুলনীতিকে অগ্রাহ্য করার অর্থ রসুলাল্লাহর কর্মপদ্ধতিকে ভুল মনে করা।

যারা জঙ্গি হচ্ছে এবং যারা জঙ্গিবাদের সমর্থক তাদের মূল প্রেরণা হচ্ছে কোর'আন-হাদীস, রসুলের ইতিহাস ইত্যাদি। তাদের ইসলামের অপব্যাখ্যা দ্বারা উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে। এই অপব্যাখ্যা বজায় রেখে, শুধু শক্তি প্রয়োগ করে সফলতার আশা করা যায় না। কারণ, পূর্বেই বলেছি- যারা জঙ্গি হয় তারা জেনে বুঝেই হয়, মৃত্যুকে ভয় পাওয়া তো পরের কথা, মৃত্যুই তাদের আকুল কামনা। এমতাবস্থায় ইসলামের সঠিক ব্যাখ্যা ও শিক্ষা প্রদান করে মানুষকে সচেতন করে তোলা ছাড়া ভিন্ন কোনো পথ নেই। শক্তি প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা আমরা যে একেবারে অস্বীকার করছি না তা শুরুতেই উল্লেখ করা হয়েছে। তবে সেটা কখন? আদর্শিক লড়াই চালানোর পরও যে স্বল্প সংখ্যক স্বার্থবাদী চরিত্রের মানুষ এই গর্হিত কাজে লিপ্ত হবে তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজন হবে শক্তি প্রয়োগের। জঙ্গিবাদ দমনে সেটা হবে অতি কার্যকরী মাধ্যম। বস্তুত সরকারের হাতে আছে আইন, শক্তি, অস্ত্র এবং আমাদের হাতে আছে আদর্শ; এই দুইয়ের যৌথ ব্যবহার করা গেলে বাংলাদেশ একদিকে ধর্ম সম্বন্ধীয় যে কোনো ঝুঁকি থেকে মুক্ত হবে, আরেকদিকে মানুষের ধর্মবিশ্বাস দেশ ও জাতির কল্যাণের পথে কাজে লাগায় জাতি অভূতপূর্ব উন্নতি লাভ করবে। ব্যক্তি যেমন উপকৃত হবে, সমাজ ও জাতিও উপকৃত হবে। মানুষের ইহকাল এবং পরকাল উভয়ই সার্থক হবে। হেযবুত তওহীদ যথাসাধ্য সে প্রচেষ্টাই চালিয়ে যাচ্ছে।

জঙ্গিদের উদ্দেশে দু'টি কথা:

যারা জঙ্গিবাদী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত বা আদর্শগত কারণে জঙ্গিবাদ সমর্থন করেন, জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রচার-প্রচারণায় তারা আহত ও ক্ষুব্ধ হতে পারেন। ভাবতে পারেন যে-

'আমরা ইসলামের জন্য জীবন বাজি রেখে তাবৎ দুনিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করছি, আল্লাহর দ্বীনকে সমুন্নত করতে প্রচেষ্টা চালাচ্ছি অথচ হেযবুত তওহীদ আমাদের কুরবানীকে অবজ্ঞা করছে, আমাদের বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লেগেছে।' প্রকৃতপক্ষে আমাদের পরিষ্কার বক্তব্য হলো, যাদের উদ্দেশ্য সৎ, যারা ইসলামের জন্য অতুলনীয় ত্যাগ স্বীকার করে এবং আল্লাহ-আল্লাহর রসুলের জন্য যাদের হৃদয়ে অপরিমেয় ভালোবাসা রয়েছে তাদেরকে আমরা কিছুতেই অবজ্ঞা করতে পারি না; কিন্তু যখন দেখি এই জাতির মূল্যবান প্রাণগুলো বিপথে পরিচালিত হয়ে অকালে ঝরে যাচ্ছে, আন্তর্জাতিক রাজনীতির নোংরা খেলায় এই জাতির দৃঢ় ঈমানের মানুষগুলো ক্রীড়নক হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে, তাদের জীবন-সম্পদ আল্লাহ-রসুলের উপকারে না লেগে ইসলাম ধ্বংসের উদ্দেশ্যে যারা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে তাদের অভিসন্ধি পূরণের রসদ যোগাচ্ছে তখন আমরা কষ্ট পাই, ব্যথিত হই। দুঃখে বুক ভেঙ্গে যায়। আমাদের সন্তানদের দিয়ে আমাদেরকেই হত্যা করাচ্ছে। আমাদের স্থাপনা, পর্যটনকেন্দ্র, মসজিদ, রাস্তাঘাটগুলো ধ্বংস করাচ্ছে। বোমার আঘাতে ছিন্নভিন্ন হচ্ছে আমাদেরই শরীর। আফগানিস্তানের মাটিতে সোভিয়েত-রাশিয়ার স্বার্থের দ্বন্দ্বে এই জাতির অকুতোভয় সন্তানদের জেহাদের নামে বলি হতে দেখে আমরা ব্যথিত হই। সাম্রাজ্যবাদীরা তাদের শোষণের পথ প্রশস্ত করার জন্য মুসলমানদের বুকে টেনে নেয়, আবার স্বার্থ ফুরিয়ে গেলে ঘৃণাভরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যখন জঙ্গি, চরমপন্থী, মৌলবাদী অপবাদ দেয় তখন আমাদেরও অন্তর্জ্বালা কম হয় না। বাস্তবতা হচ্ছে, যারা বর্তমানে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করবে বলে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে সশস্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে, তাদের বহু ত্যাগ-স্বপ্ন-সাধনা ও প্রাণক্ষয় কার্যত জাতিকে এতটুকু লাভবান করে নি। বরং ইসলামের ক্ষতিই হয়েছে। উপকার হয়েছে সাম্রাজ্যবাদের, উপকার হয়েছে ইসলামের শত্রুদের।

সুতরাং আপনারা যে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করে লড়াই করছেন, সেই ইসলামের স্বার্থেই ওপথ থেকে ফিরে আসুন। এতে আপনারা নিজেরা যেমন উপকৃত হবেন, জাতিও উপকৃত হবে। আমাদের এই দেশের মাটিতে থেকে, দেশের মানুষের কল্যাণে অবদান রাখা যায়। মু'মিন হবার জন্য জান-মাল নিয়ে ইরাক-সিরিয়া যাবার দরকার নেই; সেই জান-মাল আপনারা এই দেশের নিপীড়িত, নির্যাতিত, অন্যায়-অবিচারে ক্লিষ্ট, দরিদ্র-বুভুক্ষ, অশিক্ষা-কুশিক্ষায় জর্জরিত সাধারণ মানুষের কল্যাণে কাজে লাগান; হানাহানি, রক্তারক্তিতে লিপ্ত ও দল-মত, ফেরকা-মাজহাবে বিভক্ত জাতির মধ্যে ঐক্য, শৃঙ্খলা, মানবতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেদেরকে উৎসর্গ করুন। এতে আপনাদের দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ই সাফল্যমণ্ডিত হবে।

জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে শুধু শক্তি প্রয়োগ নয়

আদর্শিক লড়াই অপরিহার্য

"পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীরা তো এটাকে রীতিমতো হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে। আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষ ধর্মবিশ্বাসী। ধর্মব্যবসায়ী একটা শ্রেণি মানুষের এই ধর্মবিশ্বাস বা ঈমানকে ভুল পথে প্রবাহিত করে জঙ্গিবাদী ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বিস্তার ঘটাচ্ছে। সরকার এটাকে শক্তি প্রয়োগ করে নিয়ন্ত্রণ করছে কিন্তু নির্মূল করতে পারে নি।

বাংলাদেশ থেকে জঙ্গিবাদ নির্মূল প্রসঙ্গে সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, "বাংলাদেশ জঙ্গি ও সন্ত্রাসমুক্ত হলেও চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে।" ডিএমপির যুগ্ম কমিশনার মনিরুল ইসলাম বলেছেন, "জঙ্গিবাদ এ দেশ থেকে একেবারে নির্মূল করা সম্ভব নয়। আন্তর্জাতিক জঙ্গি সংগঠনদের নানা কার্যক্রমে এ দেশেও জঙ্গি তৎপরতায় অনেকে উৎসাহিত হচ্ছে।" এ বিষয়ে মতামত জানার জন্য হেযবুত তওহীদের এমাম জনাব হোসাইন মোহাম্মদ সেলিমের সাথে কথা বলেছিলেন বজ্রশক্তির সাহিত্য সম্পাদক রিয়াদুল হাসান। সাক্ষাৎকারটি সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরা হলো।

প্রতিবেদক: অতি সম্প্রতি এসএসএফ- এর ২৯তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশে জঙ্গিবাদের চ্যালেঞ্জ রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন আর অন্যদিকে গোয়েন্দা কর্মকর্তা বলেছেন যে জঙ্গিবাদ নির্মূল সম্ভব নয়। এ বিষয়ে আপনাদের বক্তব্য কী?

হেযবুত তওহীদের এমাম: দেখুন আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে কথা বলেছেন এটা দীর্ঘদিন থেকেই আমরা বলে আসছি। বিভিন্ন জনসভায়, সেমিনারে, পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে আমাদের নেতৃবৃন্দ এ কথাটাই বলে আসছেন। জঙ্গিবাদের এই চ্যালেঞ্জটা মানুষকে বুঝতে হবে। মানুষকে বুঝতে হবে যে, আমরা কিভাবে ঝুঁকির মধ্যে আছি। আপনারা জানেন যে বর্তমানের জঙ্গিবাদ ইস্যুটি ইসলাম ধর্মের বিকৃত ব্যাখ্যা থেকেই উৎপন্ন হয়েছে যার সূত্রপাত হয় সোভিয়েত-আফগান যুদ্ধের থেকে। এবং এটাকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিচ্ছে ধর্মব্যবসায়ী ও অস্ত্রব্যবসায়ীরা। পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীরা তো এটাকে রীতিমতো হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে। আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষ ধর্মবিশ্বাসী। ধর্মব্যবসায়ী একটা শ্রেণি এই ধর্মবিশ্বাসকে ভুল পথে প্রবাহিত করে জঙ্গিবাদী ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বিস্তার ঘটাচ্ছে। সরকার এটাকে শক্তি প্রয়োগ করে নিয়ন্ত্রণ করছে কিন্তু নির্মূল করতে পারেনি। আমরা অনেক আগে থেকেই বলে আসছি যে, ভুল আদর্শ থেকে উদ্ভূত এই জঙ্গিবাদকে নির্মূল করতে হলে শক্তি প্রয়োগের পাশাপাশি একটি নির্ভুল আদর্শ (Ideology) লাগবে। এ কথা এখন গোয়েন্দা সংস্থাগুলোও স্বীকার করছে। আমি বলতে চাই, সঠিক আদর্শটা আমাদের কাছে আছে। আল্লাহ আমাদেরকে সেটা দান করেছেন। আমরা মানবতার কল্যাণে, জাতির কল্যাণে সেটা দিতে চাই। এই আদর্শ দিয়েই মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। তাহলে মানুষের ধর্মবিশ্বাস আর ভুল পথে নয়, সঠিক পথে প্রবাহিত হবে।

প্রতিবেদক: এ ক্ষেত্রে আপনাদের স্বার্থ কী?

হেযবুত তওহীদের এমাম: আমরা স্পষ্টভাবে দুটা কথা বলতে চাই : প্রথমত- আমাদের অর্থনৈতিক কোনো স্বার্থ নাই। হেযবুত তওহীদ সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে মানবতার কল্যাণে কাজ করছে। ধর্মের নামে বিনিময় নেওয়া সকল ধর্মেই নিষিদ্ধ, ধর্মের নামে কোনো প্রকার বৈষয়িক স্বার্থোদ্ধার করা বৈধ নয়- আমরাই ব্যাপকভাবে এই সত্য প্রচার শুরু করেছি। কাজেই আমাদের অর্থনৈতিক কোনো স্বার্থ নেই। আর দ্বিতীয়ত- আমরা কোনো রাজনৈতিক দল না। আমাদের রাজনৈতিক কোনো অভিপ্রায়ও নেই। কাজেই ভোট চাইবার কোনো সম্ভাবনাও আমাদের নেই। আমরা মনে করি যে, বর্তমানে যারা সরকার পরিচালনা করছেন, রাজনীতি করছেন তারা যদি ন্যায়সঙ্গতভাবে জাতিকে পরিচালনা করেন তাহলেই যথেষ্ট। হুজুরপাক (সা.) এর সময়ের কথা একবার ভাবুন। আইয়্যামে জাহিলিয়াতে নিমজ্জিত অশিক্ষিত, দরিদ্র, পরস্পর যুদ্ধ-কলহে লিপ্ত চরম বিশৃঙ্খল মানুষগুলি রসুলাল্লাহর (সা.) সংস্পর্শে এসে সোনার মানুষে পরিণত হয়েছিলেন। তাদের নামের সাথেই আমরা রাদিয়াল্লাহু আনহু (রা.) বলি। ঠিক আজকে যারা পশ্চিমাদের চাপিয়ে দেওয়া অনৈক্য ও সংঘাতের রাজনীতির প্রভাবে নানা দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত রয়েছেন এবং আদর্শহীন রাজনীতির প্রভাবে ধীরে ধীরে চরম স্বার্থপরতার মধ্যে ডুবে গেছেন, আমি মনে করি আল্লাহ প্রদত্ত একটা নির্ভুল আদর্শ পেলে আমাদের রাজনীতিকরাও সৎ এবং ভাল মানুষে পরিণত হবেন। দেশকে পরিচালনা করার জন্য যারা রাজনীতি করছেন তাদেরও যথেষ্ট যোগ্যতা আছে এখন তাদেরকে শুধু ন্যায়ের পথে, সত্যের পথে এবং মানবতার কল্যাণে কাজ করতে হবে।

দেশের সকল মানুষের সুখ শান্তির লক্ষ্যে কাজ করাকে আমরা আল্লাহর এবাদত মনে করি। একজন মুমিন হিসেবে এটা আমার ঈমানী কর্তব্য এবং একজন দেশপ্রেমিক হিসেবে এটা আমার জাতীয় কর্তব্য, নাগরিক দায়িত্ব ও সামাজিক কর্তব্য। এ কর্তব্যবোধ ও চেতনা থেকেই আমরা জীবন ও সম্পদ দিয়ে মানবতার কল্যাণে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে যাচ্ছি। এই কাজের বিনিময় নেব আমরা আল্লাহর কাছ থেকে। এখানে অন্য কোনো স্বার্থ থাকার প্রশ্নই উঠে না।

প্রতিবেদক: আপনাদের ব্যাপারে তো অনেক অপপ্রচার আছে। এ বিষয়ে আপনার বক্তব্য কী?

হেযবুত তওহীদের এমাম: এ ক্ষেত্রে আমি বলব গত ২০ বছরে যত অপপ্রচার করা হয়েছে তার অধিকাংশই করেছে ধর্মব্যবসায়ীরা। তারা মাননীয় এমামুয্‌যামানকে খ্রিষ্টান, নাস্তিক বলে ফতোয়া দিয়েছে, তার ফাঁসি চেয়ে মিছিল করেছে। অপরদিকে ইসলামবিদ্বেষী মিডিয়াগুলি হেযবুত তওহীদকে অন্য দলের সাথে মিলিয়ে জঙ্গি হিসেবে অপপ্রচার করেছে। কিন্তু আল্লাহর রহম দেশের অধিকাংশ মানুষই এখন বুঝতে সক্ষম হয়েছেন যে, হেযবুত তওহীদ জঙ্গিও না, খ্রিষ্টানও না, বরং মানবতার কল্যাণে নিবেদিত, নিঃস্বার্থ আন্দোলন। হেযবুত তওহীদের প্রতিষ্ঠাতা জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী এমন একজন মহামানব যার সারাজীবনে নৈতিক স্খলনের কোনো নজির নেই, তিনি জীবনে কখনো মিথ্যা শব্দ উচ্চারণ করেননি, আইনভঙ্গের কোনো কাজ করেননি। তাঁর পূর্বপুরুষরা অর্ধসহস্র বছর ধরে এ অঞ্চলের শাসক ছিলেন। সুলতানি আমলে বৃহত্তর বাংলা (তদানীন্তন গৌড়) অঞ্চলের শাসক সোলেমান খান পন্নী, তাজ খান পন্নী ও সুলতান দাউদ খান পন্নী ছিলেন তাঁরই পূর্বপুরুষ। মুঘল আমলে সাইদ খান পন্নী (যিনি আতিয়া মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা) থেকে শুরু করে ব্রিটিশ আমলের শেষ অবধি পর্যন্ত মাননীয় এমামুয্‌যামানের পূর্বপুরুষরা (সর্বশেষ তার বাবা মেহেদী আলী খান পন্নী) টাঙ্গাইল, বৃহত্তর ময়মনসিংহ, গাজীপুর ও উত্তর বঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের শাসক তথা জমিদার ছিলেন। তাঁর পূর্বপুরুষগণের ইতিহাস ইতিহাসের পাঠকমাত্রই জানেন। আমাদের দেশে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ধর্ম প্রচারে তাদের অবদান অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। সুলতানী আমল ও মুঘল আমলে এ অঞ্চলে যে

সমস্ত সুফী, সাধকগণ ইসলাম প্রচারের জন্য আসেন তাদের অধিকাংশই পত্নী পরিবারের অত্যন্ত ঘনিষ্ট ও প্রিয়ভাজন ছিলেন। উদাহারণস্বরূপ বলি, বাবা আদম কাশ্মিরী (র.) ও তাঁর ভাগিনা শাহ জামাল (র.) (যার নামে আজকের জামালপুর জেলার নাম) সাইদ খান পন্নীর অধীনস্ত ও অত্যন্ত প্রিয়ভাজন ছিলেন। বাবা আদম কাশ্মিরীর (র.) স্মৃতিতেই সাইদ খান পন্নী আতিয়া মসজিদ করেন। অথচ সেই পরিবারের উত্তরসূরি মাননীয় এমামুয্যামানকে আজকে আলেম নামধারী মোল্লারা খ্রিষ্টান বলে ফতোয়া দেয়। এর আসল কারণ তিনি ধর্মব্যবসার বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। সত্য জানার সময় এসেছে, তাদের অপপ্রচারে এখন আর মানুষ কান দেয় না। মানুষ এখন সত্য জানছে।

প্রতিবেদক: আপনার সম্পর্কে কিছু বলুন।

হেযবুত তওহীদের এমাম: আমি অতি সাধারণ পরিবারের সন্তান। আমি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে মাস্টার্স করেছি। আমার বাবা প্রায় চব্বিশ বছর নোয়াখালীর সোনাই মুড়ি এলাকার জনপ্রতিনিধি হিসাবে জনগণের কল্যাণে কাজ করেছেন। আমি অত্যন্ত সৌভাগ্যবান এজন্য যে, আমি মাননীয় এমামুয্যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীর একজন অনুসারী, তিনি আমার শিক্ষাগুরু। তাঁর সংস্পর্শে এসে আমার জীবনটা পাল্টে গেলো। আমার জীবনের উদ্দেশ্য পরিবর্তিত হয়ে গেল। আমি পথ হারা ছিলাম, গোমরাহ ছিলাম। তাঁর মাধ্যমে আমরা সত্য পেয়েছি, মুক্তির পথ পেয়েছি, মানবতার কল্যাণে কাজ করার অনুপ্রেরণা পেয়েছি। কাজেই আমি এবং হেযবুত তওহীদের মোজাহেদ-মোজাহেদারা মানবতার কল্যাণে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করতে চাই। দেশের মানুষের জন্য অকপটচিত্তে, একাগ্রচিত্তে কিছু করতে চাই। দেশবাসীর কাছে দোয়া চাই এবং আমাদের আইনশৃঙ্খলা বাহিনীসহ সকলকে আহ্বান করব যে, আসুন আমরা নিঃস্বার্থভাবে আমাদের এই প্রিয় জন্মভূমির জন্য কাজ করি। আমি বিশ্বাস করি আল্লাহ আমাদেরকে যে মহাসত্য দান করেছেন- এই সত্য যদি মানুষ জানতে পারে তাহলে মানুষের আত্মার পরিবর্তন ঘটবে, দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটবে, মানুষ আর হিংস্র হবে না। দেশের জন্য জীবন-সম্পদ উৎসর্গ করবে অর্থাৎ মানুষ আর স্বার্থপর হবে না, আত্মকেন্দ্রিক হবে না। জাতির জন্য কল্যাণকর অবদান রাখা আমাদের সকলের সামাজিক কর্তব্য ও ধর্মীয় দায়িত্ব। সংবিধান আমাদের সকলকে আইনসঙ্গতভাবে মত প্রকাশ করার, আন্দোলন করার অধিকার দিয়েছে। এটা আমার সাংবিধানিক অধিকার, ধর্মীয় অধিকার, মৌলিক অধিকার এবং মানবাধিকার। এর জন্য বিনিময়ের প্রয়োজন হয় না, মানুষের কল্যাণমূলক কাজের, সেবামূলক কাজের কোনো বিনিময় চলে না। আমি বিনিময় পাব আল্লাহর কাছ থেকে। আমি মনে করি আমার দেশের মানুষ যদি সুখে থাকে তাহলে আল্লাহও আমাকে শান্তি দিবেন।

প্রতিবেদক: আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ সম্পর্কে কিছু বলুন।

হেযবুত তওহীদের এমাম: বিশ্বের বুকে এখন আমরা একটা স্বাধীন জাতি। ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি দুঃশাসনের বিরুদ্ধে সাড়ে সাত কোটি বাঙালির এই বীর জাতি যুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন করেছিল। কিন্তু আপনারা জানেন দীর্ঘ ৪৩ বছরে অনৈক্য আর নানামুখী দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কারণে এই জাতিটাকে একদিনের জন্যও শান্তিতে থাকতে দেয় নি। এখানে মূলত দুইটি শ্রেণির কথা আমি বলছি। ধর্মব্যবসায়ী শ্রেণি আর পশ্চিমাদের সৃষ্ট বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদ। একদিকে ধর্মব্যবসায়ীদের ফতোয়াবাজি, ফেরকাবাজি, দলবাজি, রাজনৈতিক স্বার্থে ধর্মকে ব্যবহার, আরেকদিকে রাজনৈতিক স্বার্থবাজদের হানাহানি। এই উভয় শ্রেণির অপতৎপরতার কারণে আমরা একাত্তরের সেই ঐক্যকে ধরে রাখতে পারিনি। আজকে আমরা ষোল কোটি। আমি স্বাধীনতা যুদ্ধ দেখি নি কিন্তু স্বাধীনতা যুদ্ধের মহানায়কদের জীবনী পড়েছি। তাদের প্রতি আমার একটা শ্রদ্ধাবোধ রয়েছে। বিশেষ করে স্বাধীনতার স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের মত একজন বিপ্লবী পুরুষ যিনি এই বাংলার অবহেলিত, বঞ্চিত জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। অধিকার আদায়ের জন্য মাথা উঁচু করে কথা বলার শিক্ষা দিয়েছেন। আবার মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার জিয়াউর রহমানসহ অন্যান্য কমান্ডারগণ, বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ যেসব বিষয়ে ভূমিকা রেখেছেন, আমি সেসব ইতিহাস পড়েছি, এখনো পড়ছি। কিন্তু পরবর্তীতে তাদেরই অনুসারীরা যখন একজন আরেকজনকে অশ্রদ্ধাভরে গালাগালি করছে, অপমান করছে, আমি তখন সত্যিই ব্যথিত হই। এভাবেই রাজনৈতিক হানাহানি, কোন্দল, ধর্মব্যবসায়ীদের অপপ্রচার, পারস্পরিক কাদা ছুঁড়াছুঁড়ি আমাদের স্বাধীনতাকে অর্থবহ হতে দেয়নি।

সরকার জাতির অভিভাবক। কাজেই জাতিকে ন্যায়ের পথে পরিচালিত করা সরকারেরই দায়িত্ব। সরকারের হাতে আছে শক্তি, অস্ত্র আর আছে অর্থ। কিন্তু শুধু শক্তি দিয়ে হবে না, এর পাশাপাশি নির্ভুল আদর্শও (Ideology) লাগবে। সেই আদর্শই আমরা দিতে চাই। যা জাতিকে অন্যায়ের পথ থেকে ফিরিয়ে এনে ন্যায়ের পথে পরিচালিত করবে। সরকারের প্রতি এটাই আমাদের আহ্বান, আমি যেখানে যাই সেখানেই আমি এই আহ্বানটাই করি।

প্রতিবেদক: আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য বজ্রশক্তির পক্ষ থেকে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

হেযবুত তওহীদের এমাম: আপনাকেও ধন্যবাদ।

হেযবুত তওহীদকে নিয়ে ভাবতে হবে

মসীহ উর রহমান
আমির, হেযবুত তওহীদ

গোয়েন্দা কর্মকর্তার বক্তব্য- *জঙ্গিবাদ এ দেশ থেকে একেবারে নির্মূল করা সম্ভব নয়, তবে আমাদের অভিযানের কারণে এটি নিয়ন্ত্রণে আছে।* (প্রথম আলো: ২৮.০৭.২০১৫)

যারা নিয়ন্ত্রণ (Control) ও নির্মূল (Uprooted) এর পার্থক্য বুঝবেন তাদেরকে নিশ্চয়ই বলে দিতে হবে না যে, প্রধানমন্ত্রী যে চ্যালেঞ্জের কথা ব্যক্ত করেছেন তা আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর দ্বারা মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দ্বারা যতটুকু সম্ভব অর্থাৎ নিয়ন্ত্রণে রাখা ততটুকু তারা করেছেন, কিন্তু যেটা সম্ভব হয় নি অর্থাৎ নির্মূল করা সেটার জন্য প্রয়োজন ভিন্ন পদ্ধতি, নতুন কোনো কৌশল। সেই নতুন কৌশল (Strategy) হাজির করেছে হেযবুত তওহীদ। বেশ কিছুদিন আগে (২৯/০৮/২০১৩) ডিবি (ডিএমপি) যুগ্ম কমিশনার টেলিভিশনের একটি টকশোতে বলেছিলেন, *'কোর'আন হাদীসের অপব্যাখ্যার মাধ্যমেই জঙ্গিবাদ নামক এই ভুল মতবাদের সৃষ্টি হয়েছে। এই আদর্শিক যুদ্ধে জয়ী হতে হলে কোর'আন হাদীসের সেই বিষয়গুলির সঠিক ব্যাখ্যা মানুষকে জানাতে হবে।'*

বর্তমানে অনেকেই এমন মত প্রকাশ করছেন। জাতীয় প্রেসক্লাবে এক ইফতার মাহফিলে প্রধানমন্ত্রী জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করে বলেন, *'সাংবাদিকদের সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে লেখনির মাধ্যমে গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।'* (সমকাল, ০১/০৭/১৫) স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী গত বছরের এপ্রিল মাসে বলেন, *'কেবল শক্তি প্রয়োগ নয়, গণসচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা হবে।'* (প্রিয়.কম, ০৯/০৪/১৪) এই লক্ষ্যে তিনি স্কুল-কলেজের পাঠ্যসূচিতে সংস্কার, গণমাধ্যমকে কাজে লাগানো এবং বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানকে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে প্রচার-প্রচারণায় সম্পৃক্ত করার প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন। দৈনিক 'বাংলাদেশ প্রতিদিন' এর একটি সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে, *'অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে জঙ্গিবাদ দমনে শক্তি প্রয়োগের পথ শুভ ফল বয়ে আনে না। এ ব্যাপারে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম আরও বেশি সুফলের নিশ্চয়তা দিতে পারে। জঙ্গিবাদীরা ধর্মকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করলেও এর সঙ্গে যে শান্তির ধর্ম ইসলামের কোনো সম্পর্কই নেই, সে বিষয়টি সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা সম্ভব হলে জঙ্গিবাদকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করা সম্ভব হবে।'* নিরাপত্তা বিশ্লেষক ব্রিগেডিয়ার (অব.) এম সাখাওয়াত হোসেন 'পুনরুত্থানের পথে ধর্মীয় উগ্রপন্থীরা' শীর্ষক একটি নিবন্ধে বলেন, *'বাংলাদেশের আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে শুধু আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দিয়ে মতাদর্শভিত্তিক সন্ত্রাস নির্মূল অথবা স্থায়িভাবে দমন সম্ভব নয়। বাংলাদেশের সমাজকে এ ধরনের হুমকি থেকে নিরাপদে রাখতে হলে বহুমুখী তৎপরতার প্রয়োজন হবে। প্রয়োজন রয়েছে একটি জাতীয় ঐক্যমত্য গঠনের এবং জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে রাজনৈতিক ঐক্যমত্যের ভিত্তিতে এই কালো থাবাকে প্রতিহত করা।'* (প্রথম আলো, ১২/১১/১৪) এখানে স্পষ্টত তিনি দু'টি বিষয় উল্লেখ করেছেন, এই জাতীয় ঐকমত্য গঠন এবং উদ্বুদ্ধ করার জন্য যে একটি নির্ভুল আদর্শ লাগবে সেটা কিন্তু কারো কাছেই নেই। এখানেই হেযবুত তওহীদের অপরিহার্যতা। অন্যদিকে মেজর জেনারেল এ কে মোহাম্মাদ আলী শিকদার পিএসসি (অব.) পত্রিকায় প্রকাশিত 'উগ্রবাদী জঙ্গি-সন্ত্রাস দমনে চ্যালেঞ্জ ও করণীয়' শীর্ষক নিবন্ধে আরও সরলভাবে লিখেছেন, *'জঙ্গি সংগঠনগুলোর কু-আদর্শকে পরাজিত করতে হলে সু-আদর্শের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন দরকার।'* (কালের কণ্ঠ, ২২/০৭/১৫) বস্তুত এমন মতামত এখন অনেকেই দিচ্ছেন, যার পুরো তালিকা এখানে পেশ করা অপ্রয়োজনীয়। কিন্তু যথাযথ যুক্তি-প্রমাণসহকারে সেই আদর্শিক লড়াই চালিয়ে যাবার উপাদান সরবরাহ বা পথ-নির্দেশ কেউ করতে পেরেছেন বলে আমাদের জানা নেই। একমাত্র হেযবুত তওহীদই সে কাজে এগিয়ে এসেছে। আমরা এতদিন আমাদের ক্ষুদ্র সাধ্যের সবটুকু উজাড় করে দিয়ে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে এসেছি, এখনও তা অব্যাহত আছে, কিন্তু এই সীমিত পরিসরে প্রচেষ্টা চালিয়ে আসন্ন জাতীয় সঙ্কট মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। আমরা দৃঢ়ভাবে বলতে চাই, সরকার যদি একে আরও বৃহত্তর আঙ্গিকে ছড়িয়ে দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রচারিত তথ্য-উপাত্ত ও যুক্তি-প্রমাণকে সমস্ত মানুষের নিকট পৌঁছে দেন তাহলে বাংলাদেশ জঙ্গিবাদ থেকে মুক্ত হতে পারে।

সরকারের করণীয়

সরকারের এখন একটাই করণীয়, এই মুহূর্ত থেকে যাবতীয় অন্যায়, অসত্য, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আপসহীন অবস্থান নেওয়া, কোনো অবস্থাতেই ধর্মবিরোধী কোনো কাজকে সমর্থন না দেওয়া এবং নিজেরাও তাতে না জড়ানো। কারণ এ শত-সহস্র বছর ধরে এদেশের মানুষের আবেগ অনুভূতি ধর্মের সঙ্গে জড়িত। সরকারের সংশ্লিষ্ট সকলকে এই এলাকার মানুষের ইতিহাস, সংস্কৃতি, চেতনা চৈতন্য

বিবেচনায় রেখে আচরণ করতে হবে। এটা পাশ্চাত্য নয়, প্রাচ্য। এখানে ধর্মবিরোধী কোনো উদ্যোগ ধর্মবিশ্বাসী বৃহত্তর জনগোষ্ঠী মেনে নেবে না। জোর করে তাদের অনুভূতির বিপরীত কিছু তাদের উপর চাপিয়ে দিতে গেলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে। ধর্মব্যবসায়ীরা খুব সহজেই এই অনুভূতিকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেবে এবং সরকারকে কুফরি সরকার ফতোয়া দিয়ে মাঠ গরম করবে। এই সুযোগ ধর্মব্যবসায়ীদের দেওয়া যাবে না। এজন্য সরকার নিজে যদি যুগপৎ জঙ্গিবাদ ও ইসলামের বিরুদ্ধে ঘৃণা বিস্তারকারী মতবাদের বিরুদ্ধে, আল্লাহর হুকুম পরিপন্থী সকল কাজের বিরুদ্ধে, স্বার্থসিদ্ধি ও মিথ্যার রাজনীতি, স্বজনপ্রীতি, ধর্মভিত্তিক অপরাজনীতির বিরুদ্ধে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াস নেয় তাহলে সরকারের উপর জনগণ আস্থাশীল হবে। জঙ্গি বা রাজনীতিক সন্ত্রাসীরাও কোনো ইস্যু খুঁজে পাবে না। যা সত্য ও ন্যায় সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তার সমর্থন দিতে হবে, আবার যা অসত্য ও অন্যায় তার বিরুদ্ধে সকলে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। জনগণকে এটাও বোঝাতে হবে যে, সৎ কাজের আদেশ ও অন্যায় কাজে বাধা দান করা প্রতিটি মানুষের প্রধান এবাদত, পাশাপাশি সামাজিক দায়িত্বও বটে।

সরকারকে আরেকটি বিষয় গুরুত্বের সঙ্গে উপলব্ধি করতে হবে যে, বর্তমানে সমাজে প্রচলিত বহু আচার অনুষ্ঠান, প্রথা রয়েছে যা কিনা ইসলামের মূল উৎস অর্থাৎ কোর'আনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক অর্থাৎ যেগুলো ইসলাম অনুমোদন দেয় না। কাজেই ধর্মব্যবসায়ীরা যা কিছু কায়েম করে রেখেছে সেটাই যে ইসলাম তা নয় বরং যাবতীয় সত্য ও ন্যায়ই হচ্ছে আল্লাহর হুকুম এবং প্রতিটি ধর্মের প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে মানবতার কল্যাণ সাধন। ধর্মব্যবসায়ীদের কায়েম করে রাখা বিকৃত বহুকিছু আছে যা বর্তমান সময়ে অচল, অর্থহীন ও অকল্যাণকর। সেগুলো দেখে খোদ ধর্মের উপর বীতশ্রদ্ধ ও বিদ্বিষ্ট হওয়ার কোনো কারণ নেই। সরকারকে ঐ অধর্মগুলো সম্পর্কেও জনগণকে সচেতন করে তুলতে হবে। নিছক আনুষ্ঠানিকতা নয় বরং ধর্মের প্রকৃত শিক্ষায়, মানবতার কল্যাণের শিক্ষায় গণমাধ্যম, গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম ও শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে তাদেরকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। সেই আল্লাহর দয়ায় শিক্ষা আমাদের কাছে আছে, যা বিবেচনার জন্য আমরা আমাদের সামর্থ্যের মধ্যে সর্ব উপায়ে প্রকাশ করছি।

আরো একটি বিষয় সরকারকে অবশ্যই ভাবতে হবে, মানুষ শুধু দেহ নয়, সে দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে গঠিত একটি অনন্য সৃষ্টি। কাজেই মানব সমাজে শান্তি আনতে হলে অবশ্যই এমন একটি জীবন ব্যবস্থা দরকার যেটা একাধারে তার বৈষয়িক ও মানসিক উভয় দিকের যাবতীয় সমস্যার সমাধান দিতে পারে। শুধু নৈতিক চরিত্র দিয়ে, বা শুধু দণ্ডবিধি দিয়ে শান্তি আনা যায় না। পশ্চিমা বস্তুবাদী, ভোগবাদী, জড়বাদী, একপেশে দেহসর্বস্ব জীবন ব্যবস্থা গত কয়েক শতাব্দীতে মানুষকে শুধু বৈষয়িক বা বস্তুগত উন্নতি ছাড়া কিছুই দিতে পারে নি, তাছাড়া গত কয়েক শতাব্দীতে ঐ জীবনব্যবস্থাগুলো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রয়োগ করে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছে এবং সর্বত্র সেগুলো শান্তি দিতে ব্যর্থ হয়েছে। কারণ মানুষ নৈতিকভাবে অধঃপতিত হয়ে, ফলে স্বার্থবাদী হয়ে অন্যের অধিকার হরণ করে নিয়েছে। এ থেকে মুক্তির পথ খুঁজে পেতে মানুষ এখন অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াচ্ছে, তারা বুঝতে পারছে যে পশ্চিমা সভ্যতার হাতে আর সুখের কিছু নেই। কিন্তু আমাদের কাছে আছে। মহান আল্লাহ আমাদেরকে এমন একটি জীবনব্যবস্থা দিয়েছেন যা নিখুঁত ভারসাম্যযুক্ত। এখন এর শিক্ষাগুলোকে সমাজে সঞ্চারিত করলেই মানুষ আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে মুক্ত হয়ে সমাজ, দেশ ও জাতির জন্য চিন্তা করার অবকাশ পাবে, তারা অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার অনুপ্রেরণা লাভ করবে। ফলে অবধারিতভাবে সমাজে শান্তি নেমে আসবে। তবে সেই ধর্ম অবশ্যই ধর্মব্যবসায়ীদের কায়েম করে রাখা বিকৃত ইসলাম নয়।

অতীতে বারবার হেযবুত তওহীদের ব্যাপারে বিভ্রান্তি ছড়ানো হয়েছে। এক শ্রেণির ইসলামবিদ্বেষী মিডিয়া বিভ্রান্তিকর খবরাখবর প্রচার করে আমাদের সম্পর্কে সর্বমহলে নেতিবাচক ধারণা সৃষ্টির অপচেষ্টা চালিয়েছে। তারা আদতে জঙ্গিবাদকে নিজেদের স্বার্থে জিইয়ে রাখতে চায়। তাই হেযবুত তওহীদ যতই ধর্মব্যবসা, ধর্ম নিয়ে অপরাজনীতি ও জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালাচ্ছে ততই তারা আতঙ্কিত হয়ে পড়ছে, সর্বতোভাবে চেষ্টা করছে যেন সরকার বা প্রশাসন হেযবুত তওহীদ সম্পর্কে সঠিক ধারণা না পায়। কিন্তু বিগত বিশ বছরের অক্লান্ত সংগ্রাম ও ত্যাগের ফলে আজ এ কথা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, ধর্মের নামে চলা অধর্মের বিরুদ্ধে আদর্শিক লড়াই করার উপাদান কেবল আমাদের কাছেই রয়েছে। জঙ্গিবাদ নির্মূল করার জন্যও তাই হেযবুত তওহীদের কাছে থাকা আদর্শের কোনো বিকল্প নেই।

কেউ বিশ্বাস করুক আর না করুক, সত্য এটাই যে, হেযবুত তওহীদের সাথে আল্লাহ সম্পর্কিত (Related to Allah Himself)। পৃথিবীর ইতিহাসে যখনই ধর্মের প্রকৃত রূপ হারিয়ে গেছে, শান্তি বিধানের জন্য আগত ধর্ম অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, মানুষ সরলপথ (সেরাতুল মুস্তাকীম) থেকে বিচ্যুত হয়ে বিপথগামী হয়েছে তখনই আল্লাহ ধর্মের সেই বিকৃতি শুধরে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য হেদায়াহ দিয়ে নবী-রসুল-অবতার পাঠিয়েছেন। এটাই এক বাক্যে মানবজাতির ইতিহাস। কিন্তু নবী রসুল তো আর আসবেন না। হযরত মোহাম্মদ (স.)-ই হচ্ছেন শেষ নবী। তাহলে পথহারা মানবজাতির উপায় কী হবে? সে জন্য প্রয়োজন একজন সঠিক পথ প্রদর্শকের। আজ যখন সমস্ত পৃথিবীতে ধর্ম তার স্বরূপ হারিয়ে বরং অশান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, ধর্মের নামে সর্বত্র অধর্মের জয়জয়কার চলছে, সমাজ-সভ্যতা ভয়াবহ সঙ্কটের মুখে পতিত হয়েছে তখন আমরা দেখছি আখেরী নবীর উম্মতের মধ্য থেকে একজন সত্যনিষ্ঠ মানুষ টাঙ্গাইলের ঐতিহ্যবাহী পন্নী পরিবারের সন্তান এমামুয্‌যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নীকে মহান আল্লাহ হেদায়াহ (সঠিক পথ, Right direction) ও দীনের সঠিক জ্ঞান দান করেছেন। কাজেই জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য যা কিছু দরকার তা হেযবুত তওহীদের কাছেই থাকবে তাতে অবাক হবার কিছু নেই।

এটা গেলো বিশ্বাসের ব্যাপার। আমরা সকলকে এ কথা বিশ্বাস করতে বলছি না। এমনও হতে পারে কেউ 'হেযবুত তওহীদ আল্লাহ সম্পর্কিত'- এ কথায় বিশ্বাস

রাখা তো দূরের কথা, আল্লাহর অস্তিত্বই স্বীকার করেন না। তাদেরকে বলব- আপনি বাস্তবতার দিকে লক্ষ করুন। সঙ্কট উপস্থিত হয়েছে এটা যেমন সত্য, সঙ্কটের সমাধান অতি দুর্লভ এটা যেমন সত্য, তেমনই সম্ভাব্য একটি সমাধান আমরা হাজির করেছি, এটাও তো সত্য। কাজেই সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ লাভের স্বার্থে উচিত হবে আমাদের উত্থাপিত সমাধান যাচাই করে দেখা। স্রষ্টায় বিশ্বাস-অবিশ্বাসের বিষয় নয়, আসন্ন জাতীয় সঙ্কট যে কোনো অর্থে মোকাবেলা করতে হবে, এটাই এখানে প্রধান ফ্যাক্টর। এদেশের শান্তিকামী নাগরিক হিসাবে আমরা একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেছি। কাজেই এখন সংশ্লিষ্ট সকলের উচিত হবে হেযবুত তওহীদের কর্মকাণ্ড আরও নিবিড়ভাবে জানা কেননা অস্পষ্টতা ভুল ধারণার জন্ম দেয়। এখানে আমরা আনুষঙ্গিক অনেক বিষয় সম্পর্কে আলোচনায় না গিয়ে মূল বিষয়টি বললাম। আমাদের কোনো বক্তব্যকে হুবহু নিতে হবে তাও না, এর উপরে আরও বিস্তারিত আলোচনা-পর্যালোচনা করা যেতে পারে। আমাদের বক্তব্যের যৌক্তিকতা বিচার করে যদি তা অগ্রহণযোগ্য মনে হয়, যদি এমন মনে হয় যে, আমাদের বক্তব্য দ্বারা ধর্মবিশ্বাসী মানুষ জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে অনুপ্রাণিত হবে না, তাহলে আমাদের প্রস্তাবনাকে অনায়াসে প্রত্যাখ্যান করবেন। আমরাও প্রস্তাবনা থেকে সরে আসব।

হেযবুত তওহীদের সাথে কাজ করতে দ্বিধা আসার কথা নয়। কারণ বাংলাদেশে হেযবুত তওহীদই একমাত্র আন্দোলন যাদের ধর্ম-বর্ণ-দল-মত ও শ্রেণি-পেশা নির্বিশেষে সকল মানুষের সাথে সফল মতবিনিময় করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। এই আন্দোলনের ইতিহাসে একজন কর্মীরও আইনভঙ্গের নজির নেই। তাছাড়া এই আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা এমামুয্‌যামান জনাব মোহাম্মদ বায়াজীদ খান পন্নী এমন এক পরিবারের সন্তান যে পরিবার বাংলাদেশের ইতিহাসের সুলতানী যুগ, মোগল আমল, ব্রিটিশ আমল, পাকিস্তানি আমলে এদেশের শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও অর্থনীতিতে যাদের সীমাহীন অবদান রেখেছে। তিনি কোনো অচেনা আগন্তুক নন বরং বর্তমানের অনেক বড় বড় পদে অধিষ্ঠিত রাজনীতিক ব্যক্তিত্বের জন্মেরও আগে এমামুয্‌যামান ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রাম করেছেন, সাংসদ নির্বাচিত হয়েছেন, রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন, সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। কাজেই এমামুয্‌যামানকে অবজ্ঞা করার কিছু নেই। ভুললে চলবে না সময় খুব কম। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের ক্রমাগত প্রসার ও অস্ত্র ব্যবসায়ীদের টাকার নেশা যে কোনো মুহূর্তে বিশ্বকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাঝে দিতে পারে।

আমাদের দেশে এক শ্রেণির বুদ্ধিজীবী রয়েছেন যারা সুদূরপ্রসারী (widespread) চিন্তা না করেই ইসলাম আতঙ্ক (Islamophobia) বিস্তার করেন। সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অনেকে ভাবতে পারেন যে, হেযবুত তওহীদের প্রস্তাবনা গ্রহণ করলে এই আন্দোলনের জনপ্রিয়তা বেড়ে যেতে পারে। তাদের প্রতি বলছি, হেযবুত তওহীদ কোনো রাজনৈতিক দল নয় এবং আমাদের কোনো আর্থিক স্বার্থও নেই। আমরা কেবল সাধারণ মানুষকে সকল সত্যের পক্ষে, সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে আহ্বান করছি। সত্য থেকে কি কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হয়? এ জাতির উপর জগদ্দল পাথরের মতো চেপে থাকা ধর্মব্যবসা, ধর্ম নিয়ে অপরাজনীতি, জঙ্গিবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, অনৈক্য ইত্যাদি দূর হলে জাতিই তো সর্বাধিক লাভবান হবে। জাতির সম্মুখে ভয়াবহ সঙ্কট দেখে একদিকে যেমন আমরা উদ্বিগ্ন, অন্যদিকে সে সঙ্কট নিরসনের সমাধান যেহেতু একমাত্র আমাদের কাছেই রয়েছে সে হিসেবে দায়বদ্ধও। সরকার যদি একে ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করেন এবং শক্তি প্রয়োগের পাশাপাশি জঙ্গিবাদ নির্মূলে আমাদের আদর্শও যথাযথ অবদান রাখতে সক্ষম হয় সেটাই আমাদের চরিতার্থতা, সার্থকতা। এটা একদিকে আমাদের ঈমানী কর্তব্য অন্যদিকে প্রিয় মাতৃভূমিকে অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক অশান্তি থেকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখা আমাদের সামাজিক কর্তব্য এবং এটা আমাদের অধিকারও বটে।

ব্রিটিশ প্রবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থা: গলদ কোথায়?

রাকীব আল হাসান

আমাদের দেশে প্রধানত দু'টি ধারার শিক্ষাব্যবস্থা চালু আছে। সাধারণ শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষা। প্রচলিত এই শিক্ষাব্যবস্থাটি চালু হয় মূলত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক যুগ থেকে। এরপর সময়ের পরিক্রমায় শিক্ষাব্যবস্থায় সামান্য কিছু পরিবর্তন করা হলেও মূল কাঠামো, লক্ষ্য একই রয়ে গেছে। এ প্রসঙ্গে সংক্ষেপে বলছি।

দীর্ঘ দু'শো বছর ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তিটি দাপটের সাথে পৃথিবীর বিরাট একটি অঞ্চল শাসন করে, যার মধ্যে আমাদের এই উপমহাদেশ অন্যতম। তারা এই উপমহাদেশ ছেড়ে চলে যাবার পরেও যেন এখানে তাদের স্বার্থ কায়েম থাকে সেজন্য একটি শয়তানি ফন্দি করল। প্রথমত তারা ঐ সময়ের সকল শিক্ষাব্যবস্থা বন্ধ করে দিল এবং দুইটি ধারায় শিক্ষাব্যবস্থা চালু করল। এর একটি অংশ ধর্মীয় শিক্ষা বা মাদ্রাসা শিক্ষা এবং অন্যটি সাধারণ শিক্ষা। উপমহাদেশের বড়লাট লর্ড ওয়ারেন হেসটিংস ১৭৮০ সনে ভারতের তদানীন্তন রাজধানী কলকাতায় আলীয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করল। এই মাদ্রাসায় ইসলাম শিক্ষা দেওয়ার জন্য খ্রিষ্টান পণ্ডিতরা বহু গবেষণা করে একটি নতুন ইসলাম দাঁড় করালেন যে ইসলামের বাহ্যিক রূপ বা দৃশ্য প্রকৃত ইসলামের মতো মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে সেটার আকিদা এবং চলার পথ আল্লাহর রসুলের ইসলামের ঠিক বিপরীত। সেখানে ইসলামের অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন মূল ভিত্তি তওহীদ তথা আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, ঐক্য, শৃঙ্খলা, আনুগত্য, মিথ্যার সাথে আপস না করা, অন্যায়ের প্রতিবাদ, স্বার্থহীনভাবে সমাজ ও মানুষের কল্যাণে কাজ করা, সমাজে ন্যায় ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করা, মানবতা, মনুষ্যত্ব, দেশপ্রেম ইত্যাদি বিষয়ের কোনো গুরুত্ব এখানে রাখা হলো না। এখানে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে শেখানো

হলো খুঁটি-নাটি মাসলা-মাসায়েল আর ব্যক্তিগত আমল করে জান্নাতে যাওয়ার পদ্ধতি (যদিও মানুষকে অশান্তিতে রেখে হাজার ব্যক্তিগত আমল করেও জান্নাতে যাওয়া যাবে না)। ধর্মের প্রকৃত উদ্দেশ্য যে মানুষের কল্যাণ সেটা ভুলিয়েই দেওয়া হলো। অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেয়ে ছোটখাটো নফল, মুস্তাহাব আমলের গুরুত্বই অধিক ফুটিয়ে তোলা হলো। দেশের মঙ্গলের জন্য, সমাজের শান্তির জন্য, মানুষের কল্যাণের জন্য কাজ করা যে আল্লাহর সন্তুষ্টির অন্যতম উপায়, জান্নাতে যাবার জন্য সর্বোত্তম এবাদত এটা তাদের জ্ঞানে নেই।

এই শিক্ষাব্যবস্থার সিলেবাসে অঙ্ক, ভূগোল, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষা ইত্যাদির কোনো কিছুই রাখা হলো না, যেন মাদ্রাসা থেকে বের হয়ে এসে আলেমদের রুজি-রোজগার করে খেয়ে বেঁচে থাকার জন্য এই দীন, ধর্ম বিক্রি করে রোজগার করা ছাড়া আর কোনো পথ না থাকে। ব্রিটিশরা এটা এই উদ্দেশ্যে করল যে তাদের মাদ্রাসায় শিক্ষিত এই মানুষগুলো যাতে বাধ্য হয় দীন বিক্রি করে উপার্জন করতে এবং তাদের ওয়াজ নসিহতের মাধ্যমে বিকৃত ইসলামটা এই জনগোষ্ঠীর মন-মগজে স্থায়িভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। ব্রিটিশরা তাদের এই পরিকল্পনায় শতভাগ সাফল্য লাভ করল। এই মাদ্রাসা প্রকল্পের মাধ্যমে দীনব্যবসা বা ধর্মব্যবসা ব্যাপক বিস্তার লাভ করল এবং এর মাধ্যমে মুসলিমদের মধ্যেও অন্যান্য ধর্মের মতো একটি স্বতন্ত্র পুরোহিত শ্রেণি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করল। তারা দীনের বহু বিতর্কিত বিষয় নিয়ে তর্ক-বাহাশ এবং ফলশ্রুতিতে বিভেদ-অনৈক্যের সৃষ্টি করতে থাকলো, যার দরুন জাতি খ্রিষ্টান প্রভুদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার শক্তি হারিয়ে ফেলল। এই পুরোহিত শ্রেণির কর্মকাণ্ডের ফলে তাদেরকে অনুসরণকারী বৃহত্তর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর চরিত্র প্রকৃতপক্ষেই পরাধীন দাস জাতির চরিত্রে পরিণত হলো, কোনোদিন তাদের প্রভুদের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াবার চিন্তা করারও শক্তি রইল না। ফলে তারা চিরতরে নৈতিক মেরুদণ্ড হারিয়ে ফেলে সমাজের উচ্চ শ্রেণির মুখাপেক্ষী হয়ে রইল।

এভাবেই খ্রিষ্টান পণ্ডিতরা নিজেরা অধ্যক্ষ থেকে ১৯২৭ সন পর্যন্ত ১৪৬ বছর ধরে এই মুসলিম জাতিকে এই বিকৃত ইসলাম শেখাল। অতঃপর তারা যখন নিশ্চিত হলো যে, তাদের তৈরি করা বিকৃত ইসলামটা তারা এ জাতির হাড়-মজ্জায় ঢুকিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছে এবং আর তারা কখনও এটা থেকে বের হতে পারবে না তখন তারা ১৯২৭ সনে তাদের আলীয়া মাদ্রাসা থেকেই শিক্ষিত মওলানা শামসুল ওলামা কামাল উদ্দিন আহমেদ (এম.এ.আই.আই.এস) এর কাছে অধ্যক্ষ পদটি ছেড়ে দিল, এর আগে পর্যন্ত মোট ৪৬ জন খ্রিষ্টান পণ্ডিত এই মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল পদে আসীন ছিল। (আলীয়া মাদ্রাসার ইতিহাস, মূল- আ. সাত্তার, অনুবাদ- মোস্তফা হারুন, ইসলামী ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ, Reports on Islamic Education and Madrasah Education in Bengal" by Dr. Sekander Ali Ibrahimy (Islami Faundation Bangladesh), মাদ্রাসা-ই-আলিয়ার ইতিহাস, মাওলানা মমতাজ উদ্দীন আহমদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ)।

অপরদিকে সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত অংশটিতে এই বিরাট এলাকা শাসন করতে যে সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনের কেরাণীর কাজ করার জনশক্তি প্রয়োজন সেই উপযুক্ত জনশক্তি তৈরি করার বন্দোবস্ত করা হলো। তারা এতে ইংরেজি ভাষা, সুদভিত্তিক অঙ্ক, বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক, প্রযুক্তিবিদ্যা অর্থাৎ পার্থিব জীবনে যা যা প্রয়োজন হয় তা শেখানোর বন্দোবস্ত রাখল। এখানে আল্লাহ, রসুল, আখেরাত ও দীন সম্বন্ধে প্রায় কিছুই রাখা হলো না। এখানেও জাতীয় ঐক্য, শৃঙ্খলা, আনুগত্য, দেশপ্রেম, ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা তথা মানুষের কল্যাণের দিক ইত্যাদি নীতি-নৈতিকতা অর্থাৎ এক কথায় ধর্মের শিক্ষার কিছুই রাখা হলো না। ইসলামের গৌরবময় ইতিহাসের পরিবর্তে ইউরোপ-আমেরিকার রাজা-রাণীদের ইতিহাস, তাদের শ্রেষ্ঠত্বের কাহিনীই শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হলো। ফলে এই সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণিটি মনে-প্রাণে প্রভুদের সম্বন্ধে একধরনের ভক্তি ও নিজেদের অতীত সম্বন্ধে হীনমন্যতায় ভুগতে লাগলো। বাস্তবতা এমন হয়ে দাঁড়ালো যে তারা নিজেদের প্রপিতামহের নাম বলতে না পারলেও ইউরোপীয় শাসক, কবি, সাহিত্যিকদের তস্য-তস্য পিতাদের নামও মুখস্থ করে ফেলল। নিজেদের সোনালী অতীত ভুলে যাওয়ায় তাদের অস্থিমজ্জায় এটা প্রবেশ করল যে সর্বদিক দিয়ে প্রভুরাই শ্রেষ্ঠ। এই শিক্ষাব্যবস্থা থেকে যারা যত শিক্ষিত হয়ে বের হতে লাগল তারা তত নীতি-নৈতিকতা বিবর্জিত, স্বার্থবাদী, ভোগ-বিলাসী চরিত্রের হতে লাগল। এরাই সমাজের বড় বড় আসনে বসে দেশের সম্পদ আত্মসাৎ করতে লাগল আর বিদেশের ব্যাংকে অর্থ পাচার, বিদেশে বাড়ি-গাড়ি করা, সন্তানকে লেখা-পড়া করানোর জন্য সেখানেই পারিবারিক সেটলমেন্ট ইত্যাদি করে দেশের ক্ষতি সাধন করতে লাগল।

সবচাইতে ভয়ঙ্কর ও বিপজ্জনক যে দিকটি তা হচ্ছে এই ইউরোপীয় ধর্মবর্জিত ভোগবাদী, বস্তুবাদী (Materialistic) যে জীবনব্যবস্থা এই জাতির উপর চাপিয়ে দিল সেই জীবনব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার জন্য সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন করল, সেই শিক্ষার উদ্দেশ্যই হলো স্বার্থ, ব্যক্তিস্বার্থ। যেখানে আল্লাহর দেওয়া জীবনব্যবস্থার উদ্দেশ্যই হলো পৃথিবীর মানুষের কল্যাণ, শান্তি। এই ব্যবস্থায় যিনি শিক্ষিত হবেন তার শিক্ষার উদ্দেশ্যই হবে নিঃস্বার্থভাবে অন্য মানুষের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করা। আর ব্রিটিশ প্রবর্তিত শিক্ষার উদ্দেশ্যই হলো স্বার্থপরতা। নিজের উন্নতি, সমৃদ্ধি, সুখ, উপভোগ, বিলাস ইত্যাদিই হলো উদ্দেশ্য। অন্য মানুষ সুখে আছে না দুঃখে আছে এটা তাদের ভাবার বিষয় নয়। অর্থাৎ জীবনের উদ্দেশ্যই ঘুরিয়ে দিল।

এখন যদি আমরা একটি উন্নত জাতি গঠন করতে চাই, যদি দুর্নীতিমুক্ত শান্তিপূর্ণ নিরাপদ সমাজ চাই তবে প্রথমেই লাগবে সুশিক্ষিত চরিত্রবান দেশপ্রেমিক ও মানবপ্রেমী নিঃস্বার্থ কিছু মানুষ। এর জন্য শিক্ষাব্যবস্থার মৌলিক কিছু পরিবর্তন অপরিহার্য। শিক্ষাব্যবস্থা ছাড়াও আপামর জনতাকে কিছু মৌলিক ও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিক্ষা প্রদানের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

ধর্মবিদ্বেষীদের হত্যার পথ ইসলাম সম্মত নয় কেন?

রিয়াদুল হাসান

মতবাদভিত্তিক সন্ত্রাস প্রতিহত বা নির্মূল করার একমাত্র উপায় হচ্ছে ঐ মতবাদকে মিথ্যা প্রমাণ করা। জঙ্গিবাদ একটি মতবাদগত সন্ত্রাস। আমাদের সরকার নয় কেবল, বিশ্বময় এই জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে শক্তিপ্রয়োগের পন্থা বেছে নেওয়া হয়েছে। এর কারণ কারো কাছেই জঙ্গিবাদীদের মতবাদকে অসার ও মিথ্যা প্রমাণ করার মতো কোনো যুক্তি প্রমাণ নেই। শুধু 'ইসলাম শান্তির ধর্ম' বললেই জঙ্গিরা তাদের পথ থেকে নিবৃত হবে না। বর্তমানে আমাদের দেশে একমাস দেড়মাস অন্তর একজন করে ব্লগার হত্যা করা একটি রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রেই দায় স্বীকার করেছে কোনো না কোনো জঙ্গিগোষ্ঠী, কোনো কোনো ক্ষেত্রে হাতে নাতে ধরাও পড়েছে।

জঙ্গিরা আল্লাহ ও রসুলের বিরুদ্ধে অপপ্রচারকারীদেরকে হত্যা করাকে নিজেদের ঈমানী দায়িত্ব বলে মনে করেন। কিন্তু আসলে কি এমন নির্দেশ আল্লাহ বা রসুল দিয়েছেন? আসুন দেখা যাক এ বিষয়ে আল্লাহর কী সিদ্ধান্ত। আল্লাহ বলেন,

১। লোকেরা যেসব কথাবার্তা রচনা করে বেড়াচ্ছে, সে জন্য তুমি ধৈর্যধারণ করো এবং সৌজন্য রক্ষা করে তাদের থেকে সম্পর্কহীন হয়ে যাও। বিত্ত-বৈভবের অধিকারী মিথ্যারোপকারীদেরকে আমার হাতে ছেড়ে দাও এবং তাদেরকে কিছু অবকাশ দাও। নিশ্চয় আমার কাছে আছে শিকল ও অগ্নিকুণ্ড। (সুরা মুযযাম্মিল: ১০-১২)

সুতরাং বোঝা গেল আল্লাহ অপপ্রচারের বিরুদ্ধে ধৈর্য ধারণ করতে হুকুম দিচ্ছেন এবং তাদেরকে কোনোরূপ পার্থিব শাস্তি না দিয়ে আল্লাহর হাতে সমর্পণ করতে বলছেন। আল্লাহই তাদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহ আরো বলেন,

২। তোমরা যেখানেই আল্লাহর আয়াতের বিরুদ্ধে কুফরীর কথা বলতে এবং ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতে শুনবে, সেখানে তোমরা আদৌ বসবে না, যতক্ষণ না তারা অন্য কোনো কথায় লিপ্ত হয়। তোমরা যদি তা করো, তবে তোমরাও তাদেরই মতো হবে। (সুরা আন নিসা: ১৪০)

৩। তুমি যখন দেখবে, লোকেরা আমার আয়াতসমূহের দোষ সন্ধান করছে, তখন তাদের নিকট থেকে সরে যাও। (সুরা আনয়াম: ৬৮)

৪। আর জাহেল লোকেরা তাদের সাথে কথা বলতে এলে বলে দেয়: তোমাদের প্রতি সালাম। (সুরা আল ফুরকান: ৬৩)

৫। জাহেল লোকদের থেকে বিরত থাক। (সুরা আল আরাফ: ১৯৯)

সুতরাং যারা ইসলামের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনাকারী আল্লাহ মো'মেনদেরকে বলছেন তাদের সঙ্গে কোনোরূপ বিতর্ক বা সংঘাতে না জড়াতে। উপরন্তু তাদেরকে সালাম দিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে এড়িয়ে চলতে আদেশ করেছেন।

আল্লাহ ও রসুলের বিরুদ্ধে যারা ভয়াবহ অশ্লীল বক্তব্যসম্বলিত কার্টুন চলচ্চিত্র, সাহিত্য রচনা করে তাদের বিরুদ্ধে ধর্মপ্রাণ মানুষের হৃদয়ে ক্ষোভ সঞ্চারিত হবে এটা স্বাভাবিক। কিন্তু এই ক্ষোভের বশবর্তী হয়ে তারা যেন কোনো ভুল কাজ না করে ফেলেন বা অতিমাত্রায় সন্তপ্ত না হন মোমেনদেরকে আল্লাহ সেজন্য সান্ত্বনা দান করেছেন। তিনি বলেন,

৬. এ লোকেরা যে সব কথা বলে তা যেন তোমাকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও দুঃখিত না করে। তাদের প্রকাশ্য ও গোপন সব কথাই আমি জানি। (সুরা ইয়াসীন: ৭৬)

৭. এ লোকদের কার্যকলাপ তুমি দুঃখিত হয়ো না আর তাদের অবলম্বিত ষড়যন্ত্রের দরুন হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করো না। (সুরা আন নাহল: ১২৭)

তাহলে অপপ্রচারকারীদের ব্যাপারে মো'মেনদের করণীয় কী হওয়া উচিত? সেটা হচ্ছে আল্লাহ কী বলেছেন আর সে মোতাবেক আল্লাহর রসুল কী করেছেন তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। আল্লাহর রসুলকে আজ গালি দেওয়া হয় বিভিন্ন গণমাধ্যমে। কিন্তু রসুল যখন মক্কায় ছিলেন তখন তো তাঁর সামনেই তাঁকে অকথ্যভাষায় গালাগালি করা হয়েছে। তাঁকে গণক, পাগল, জাদুকর, মিথ্যুক বলা হয়েছে, তাঁকে শারীরিকভাবে নির্যাতিত লাঞ্ছিতও করা হয়েছে। রসুলাল্লাহ কি পারতেন না তাঁর অনুগত আসহাবদের হুকুম দিয়ে আবু জেহেলকে কুপিয়ে হত্যা করাতে? অবশ্যই পারতেন কিন্তু আল্লাহর হুকুম তা ছিল না। তিনি আল্লাহর হুকুম মোতাবেক মানুষের সামনে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য প্রচার করে গেছেন। একটা সময় এসেছে যখন এককালের চরম নির্যাতনকারী ইসলাম গ্রহণ করে রসুলাল্লাহর শক্তি বৃদ্ধি করেছেন। একেই বলে আদর্শিক লড়াই, সত্য ও মিথ্যার দ্বন্দ্ব। আল্লাহ বলেছেন,

৮. হে শ্রোতা! মন্দকে ভালো দ্বারা প্রতিহত করো! তখনই ঐ ব্যক্তি সে, এমন হয়ে যাবে যেমন অন্তরঙ্গ বন্ধু। (সুরা হা-মীম সাজদাহ, আয়াত-৩৪)

৯. নবী ও রসুলগণ প্রত্যেকে তাঁদের স্ব স্ব সম্প্রদায়কে বলেছেন, আমাদের দায়িত্ব তো কেবল সুস্পষ্টভাবে সংবাদ পৌঁছে দেয়া (সুরা ইয়াসীন ১৭)।

বিশ্বজুড়ে চলমান ইসলামবিদ্বেষী প্রপাগান্ডা ও তার প্রতিবাদে কতিপয় মুসলিম দাবিদার যারা প্রতিহিংসাবশত সহিংসতার পথ বেছে নিচ্ছেন তাদেরকে বুঝতে হবে যে, প্রকৃপতক্ষে ইসলাম একটি আদর্শ ও পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা

(Ideology বা complete code of life)। কাজেই অন্য কোনো আদর্শের অনুসারীরা এর সমালোচনা করতেই পারেন, তাদের দৃষ্টিতে কোনো অসঙ্গতি তুলে ধরতেই পারেন।

আল্লাহ নিজেই তাঁর সৃষ্টির এবং কোর'আনের অসঙ্গতি খুঁজে বের করার জন্য বার বার আহ্বান করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন, তুমি করুণাময় আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিতে কোন খুঁত দেখতে পাবে না। আবার দৃষ্টি ফেরাও, কোন ভুল দেখতে পাও কি? অতপর তুমি বার বার তাকিয়ে দেখ, তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ ও পরিশ্রান্ত হয়ে তোমার দিকেই ফিরে আসবে (সুরা মুলক আয়াতঃ ৩-৪)।

এখানে আল্লাহ শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন তাফওয়াতিন যার অর্থ Fault, Flaw, অসামঞ্জস্য, বৈপরীত্য, ভুল এবং ফুতুরিন যার অর্থ খুঁত, ফাটল, চিড়, ভাঙ্গন, ত্রুটি, অসঙ্গতি ইত্যাদি (আরবী-বাংলা অভিধান ২য় খণ্ড, পৃ: ৪৫০, ইফাবা)।

কাজেই আল্লাহ স্বয়ং যেখানে তাঁর কোর'আন সম্পর্কে, সৃষ্টি সম্পর্কে, আয়াত এমন কি তাঁর নিজের সম্পর্কে ভুল সন্ধান করার জন্য আহ্বান করছেন, সেখানে কেউ যদি ইসলামের বিরুদ্ধে কোনো সমালোচনা করে, তার দৃষ্টিতে ধরা পড়া কোনো অসঙ্গতি তুলে ধরে তাহলে তার বিরুদ্ধে আক্রোশ প্রদর্শন করা, তাকে আক্রমণ করা, তাকে হত্যা করা ইত্যাদি অবশ্যই অন্যায্য, অপ্রগতিশীল, ক্ষুদ্রতা, অযৌক্তিক ও আল্লাহর অভিপ্রায় বহির্ভূত কাজ। এক্ষেত্রে যেটা করণীয় তা হচ্ছে, আগে নিজেরা যাবতীয় ফেরকা, মাজহাব, তরিকা, দল-উপদল (রাজনীতিক ও ধর্মীয়) ইত্যাদি যত দুর্ভাগ্যজনক বিভেদ-বিভক্তি জাতির মধ্যে রয়েছে তা ভুলে সত্যের পক্ষে, ন্যায়ের পক্ষে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ইস্পাত-কঠিন ঐক্যবদ্ধ হওয়া। কারণ ঐক্যবদ্ধ শক্তির সামনে মিথ্যা ধূলিসাৎ হতে বাধ্য। তারপর উত্তম যুক্তি-তর্ক, তথ্য-উপাত্ত ইত্যাদি দিয়ে নিজেদের মতামতকে সমুন্নত করা এবং মিথ্যা অভিযোগ ব্যর্থ প্রমাণ করা। এ কথাটিই আল্লাহ বলেছেন কোর'আনময়।

ইসলাম বিদ্বেষীরা মূলত বিকৃত ইসলামের কূপমণ্ডুক পুরোহিত আলেম সমাজের কর্মকাণ্ড ও প্রগতিবিরোধী, ধ্যানধারণাকে ইসলাম বলে ধরে নিয়ে আল্লাহ-রসুলের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন। যারা কূপমণ্ডুক ধর্মব্যবসায়ীদের অযৌক্তিক কর্মকাণ্ড দেখে আল্লাহ-রসুল, ধর্মগ্রন্থসমূহ, অবতারগণ এবং তাঁদের পরিবারের বিরুদ্ধে কটূক্তি করেন, ব্যাঙ্গচিত্র এঁকে, অশ্লীল সাহিত্য লিখছেন তাদের প্রতি কথা হচ্ছে, সমালোচনা এক জিনিস আর গালিগালাজ আরেক জিনিস।

অন্ধ-ধর্মবিদ্বেষী আচার আচরণ করে ধর্মবিশ্বাসী তথা ঈমানদার মানুষের মনে আঘাত করে সমাজে একটি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা কোনোভাবেই বিজ্ঞানমনস্কতা, মুক্তমনের পরিচায়ক নয়। আপনারা ইসলামের বিরুদ্ধে তথ্য-উপাত্ত ইত্যাদি উপস্থাপন করে গঠনমূলক যৌক্তিক সমালোচনা করুন। সে পথ রুদ্ধ নয়। আল্লাহ তাঁর নবীদেরকে এ পর্যন্ত বলার হুকুম দিয়েছেন যে, তোমরা সবাই মিলে আমার অনিষ্ট করার প্রয়াস চালাও, অতঃপর আমাকে কোন অবকাশ দিও না। (সুরা হুদ ৫৫)। আরো বলতে বলেছেন, হে আমার সম্প্রদায়, যদি তোমাদের মাঝে আমার অবস্থিতি এবং আল্লাহর আয়াতসমূহের মাধ্যমে নসীহত করা ভারী বলে মনে হয়ে থাকে, তবে আমি আল্লাহর উপর ভরসা করছি। এখন তোমরা সবাই মিলে নিজেরদের কর্ম সাব্যস্ত কর এবং এতে তোমাদের সহযোগীদেরকেও সমবেত করে নাও, যাতে তোমাদের মাঝে নিজেদের কাজের ব্যাপারে কোন সন্দেহ-সংশয় না থাকে। অতঃপর আমার সম্পর্কে যা কিছু করার করে ফেল এবং আমাকে অব্যাহতি বা অবকাশ (Respite) দিও না (সুরা ইউনুস ৭২)। সুতরাং আয়াতের বিরোধিতা বা সত্য প্রচারকারীর বিরোধিতা করার প্রকাশ্য আহ্বান আল্লাহ বহুভাবে বার বার করেছেন। একে যারা রোধ করে তারা আল্লাহর অভিপ্রায় সম্পর্কে অজ্ঞ।

আমাদের সামাজে যারা পশ্চিমাদের অনুকরণে ইসলামের গড়-পড়তা সমালোচনা করছেন তাদের উদ্দেশে আমাদের আরো কথা হচ্ছে, ধর্মের নামে সমাজে বহুকিছুই চলছে যা প্রকৃতপক্ষে বিকৃতির ফসল। বিগত ১৩০০ বছরে প্রকৃত ইসলাম বিকৃত হতে হতে সেই বিকৃতি আজ চূড়ান্ত রূপ ধারণ করেছে। ফলে এমন অনেক কিছুই চলছে যেগুলো কোর'আনের হুকুমের ঠিক বিপরীত, যেগুলো অযৌক্তিক, অন্ধত্ব, কূপমণ্ডুকতা, অবৈজ্ঞানিক এবং মানুষের জন্য অকল্যাণকর। যুগে যুগে ধর্মব্যবসায়ী ও স্বার্থান্বেষী একটি গোষ্ঠী ধর্মের নামে এগুলো চালু করে দিয়েছে। এটি কেবল ইসলামে নয়, অন্য সকল ধর্মের ক্ষেত্রেও হয়েছে। কাজেই সেই অযৌক্তিক কর্মকাণ্ডগুলো দেখে খোদ ধর্মের উপর বিদ্বেষ পোষণ করাও আরেক ধরনের অজ্ঞানতা। যারা ধর্মবিদ্বেষী হয়ে সমালোচনা করছেন, তারা রসুলাল্লাহর মতো একজন প্রভাব বিস্তারকারী ব্যক্তিত্ব, যিনি আরবের আইয়্যামে জাহেলিয়াতের অজ্ঞতা, কুসংস্কার, হানাহানিতে লিপ্ত মানুষগুলোকে এমন একটি সভ্য জাতিতে পরিণত করেছিলেন যারা পরবর্তী এক হাজার বছরে পৃথিবীর মধ্যে সর্বদিকে শ্রেষ্ঠত্বের আসন অধিকার করেছিল। যিনি মানবইতিহাসে এবং সমাজ পরিবর্তনে এমন বিপ্লবী ভূমিকা রাখলেন তাঁর সেই অবদানের দিকে দৃষ্টিপাত না করে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে দিনের পর দিন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, কার্টুন আঁকা, অশ্লীল সাহিত্য লেখা মানে বিরাট হিমালয়ের সামনে দাঁড়িয়ে একটি নুড়ি পাথর নিয়ে পড়ে থাকা। অন্ধকারকে অন্ধকার দিয়ে প্রতিহত করা যায় না, আলো দিয়ে প্রতিহত করতে হয়। তাই ধর্মের অন্ধত্বের বিরুদ্ধে ধর্মের প্রকৃত সত্যগুলো তুলে ধরার ক্ষেত্রে আপনারা আপনাদের মেধাকে ব্যবহার করুন, বিকৃত ধর্মব্যবসা ও জঙ্গিবাদকে আদর্শিক মোকাবেলা দ্বারা বিলুপ্ত করে দিন, অবশ্য যদি আপনাদের সৎ ও মহৎ উদ্দেশ্য থাকে, দেশ, জাতি, সমাজ ও মানবতার কল্যাণে কিছু করার ইচ্ছা থাকে। আর যদি সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে নিজেদের লাইম লাইটে নিয়ে আসার অভিসন্ধি করে থাকেন তাহলে সেটা ভিন্ন কথা। কাজেই একদিকে ধর্মবিশ্বাসীদের অন্ধত্ব অন্যদিকে ধর্মবিদ্বেষীদের অন্ধত্ব এই উভয়ের অপকারিতা থেকে মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।